চারুপাঠ

দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

// জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক
অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী
অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ
অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ্ খান
অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক
অধ্যাপক শ্যামলী আকবর
অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর
ড. সরকার আবদুল মান্নান
ড. শোয়াইব জিবরান
শামীম জাহান আহসান

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১১
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৬
পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০২০
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

চারুপাঠ ষষ্ঠ শ্রেণির দাখিল শিক্ষার্থীদের বাংলা বিষয়ের নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক। শিক্ষাক্রমের অনুসরণে শিখনফল অর্জনে সহায়ক গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ–এ সকল বিষয় বইয়ে সংকলন করা হয়েছে। এতে করে শিক্ষার্থীরা জীবন ও জগতের বিচিত্র বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠবে এবং তাদের পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি হবে। বিষয় নির্বাচনের সময় শিক্ষার্থীদের ধারণক্ষমতার কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে সে বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বিষয়বস্তুর এই বৈচিত্র্য শিক্ষার্থীদের কেবল সাহিত্যের রস উপভোগের সুযোগ তৈরি করে দেবে না; তাদের মানবিক উৎকর্ষ সাধনেও ভূমিকা পালন করবে। আশা করা যায়, পাঠ্যপুস্তকটি প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে এবং লেখক সম্পাদকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের শ্রম সার্থক হবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

সততার পুরস্কার

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

সেকালে আরব দেশে তিনটি লোক ছিল– একজনের সর্বাঙ্গে ধবল, একজনের মাথায় টাক, আরেকজনের দুই চোখ অন্ধ। আল্লাহ তাহাদের পরীক্ষার জন্য এক ফেরেশতা পাঠাইলেন। ফেরেশতা হইলেন আল্লাহর দূত। তাহারা নূরের তৈয়ারী। এমনি কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পায় না। আল্লাহর হুকুমে তাহারা সকল কাজ করিয়া থাকেন।

ফেরেশতা মানুষের রূপ ধরিয়া প্রথমে ধবলরোগীর নিকটে আসিলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন, কী তুমি সবচেয়ে ভালোবাসো?

ধবলরোগী বলিল, আহা! আমার গায়ের রং যদি ভালো হয়। সকলে যে আমাকে বড় ঘৃণা করে।

স্বর্গীয় দূত তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন। তাহার রোগ সারিয়া গেল। তাহার গায়ের চামড়া ভালো হইল।

তারপর আল্লাহর দূত পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন তুমি কী চাও?

সে বলিল, আমি উট চাই।

দূত তাহাকে একটি গাভিন উট দিয়া বলিলেন, এই লও। ইহাতে তোমার ভাগ্য খুলিবে।

তারপর সেই ফেরেশতা টাকওয়ালার কাছে গিয়া বলিলেন, কী তুমি সবচেয়ে ভালোবাসো?

সে বলিল, আহা! আমার এই রোগ যদি সারিয়া যায়। যদি আমার মাথায় চুল উঠে!

আল্লাহর দূত তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন। তাহার টাক সারিয়া গেল। তাহার মাথায় চুল গজাইল। দূত পুনরায় বলিলেন, এখন তুমি কী চাও?

সে বলিল, গাভি।

তিনি তাহাকে একটি গাভিন গাই দিয়া বলিলেন, এই লও। ইহাতে তোমার ভাগ্য খুলিবে।

তারপর স্বর্গীয় দূত অন্ধের কাছে গেলেন। গিয়া বলিলেন, কী তুমি সবচেয়ে ভালোবাসো?

সে বলিল, আল্লাহ্ আমার চোখ ভালো করিয়া দিন। আমি যেন লোকের মুখ দেখিতে পাই।

স্বর্গীয় দূত তাহার চোখে হাত বুলাইয়া দিলেন। তাহার চোখ ভালো হইয়া গেল।

তারপর তিনি তাহাকে বলিলেন, এখন তুমি কী চাও?

সে বলিল, আমি ছাগল চাই।

স্বর্গীয় দূত তাহাকে একটি গাভিন ছাগল দিয়া বলিলেন, এই লও। ইহাতে তোমার ভাগ্য খুলিবে।

তারপর উটের বাচ্চা হইল, গাভির বাছুর হইল, ছাগলের ছানা হইল। এই রকম করিয়া উটে, গাভিতে, ছাগলে তাহাদের মাঠ বোঝাই হইয়া গেল।

কিছুদিন পর আবার সেই ফেরেশতা পূর্বের মতো মানুষের রূপ ধরিয়া, সেই যে আগের ধবলরোগী ছিল, তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

সেখানে গিয়া তিনি বলিলেন, আমি এক বিদেশি। বিদেশে আসিয়া আমার সব পুঁজি ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন আল্লাহর দয়া ছাড়া আমার আর দেশে ফিরিবার উপায় নাই। যিনি তোমারে সুন্দর গায়ের রং দিয়াছেন, সুন্দর চামড়া দিয়াছেন, আর এত ধনদৌলত দিয়াছেন, তাঁহার দোহাই দিয়া তোমার কাছে একটি উট চাহিতেছি।

সে বলিল, উটের অনেক দাম, কী করিয়া দিই?

স্বর্গীয় দূত বলিলেন, ওহে ! আমি যেন তোমাকে চিনিতে পারিতেছি। তুমি না ধবলরোগী ছিলে, আর সকলে তোমাকে ঘৃণা করিত? তুমি না গরিব ছিলে, পরে আল্লাহ্ তোমাকে ধনদৌলত দিয়াছেন?
সে বলিল, না, তা কেন? এসব তো আমার বরাবরই আছে।

স্বর্গীয় দূত বলিলেন, আচ্ছা ! যদি তুমি মিথ্যা বলিয়া থাক, তবে তুমি যেমন ছিলে আল্লাহ্ আবার তোমাকে তাহাই করিবেন।

তারপর স্বর্গীয় দূত পূর্বে যে টাকওয়ালা ছিল, তাহার কাছে গেলেন। সেখানে গিয়া আগের মতো একটি গাভি চাহিলেন। সেও ধবলরোগীর মতো তাহাকে কিছুই দিল না। তখন স্বর্গীয় দূত বলিলেন, আচ্ছা, যদি তুমি মিথ্যা কথা বলিয়া থাক, তবে যেমন ছিলে আল্লাহ্ তোমাকে আবার তেমনি করিবেন।

তারপর স্বর্গীয় দূত পূর্বে যে অন্ধ ছিল, তাহার কাছে গিয়া বলিলেন, আমি এক বিদেশি। বিদেশে আমার সম্বল ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন আল্লাহর দয়া ছাড়া আমার দেশে পৌঁছিবার আর কোনো উপায় নাই। যিনি তোমার চক্ষু ভালো করিয়া দিয়াছেন, আমি তোমাকে সেই আল্লাহর দোহাই দিয়া একটি ছাগল চাহিতেছি: যেন আমি সেই ছাগল-বেচা টাকা দিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে পারি।

তখন সে বলিল, হ্যাঁ ঠিক তো। আমি অন্ধ ছিলাম, পরে আল্লাহ্ আমাকে দেখিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। আমি গরিব ছিলাম, তিনি আমাকে আমির করিয়াছেন। তুমি যাহা চাও লও। আল্লাহর কসম, আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে জিনিস লইতে তোমার মন চায়, তাহা যদি তুমি না লও, তবে আমি তোমাকে কিছুতেই ভালো লোক বলিব না।

ফেরেশতা তখন বলিলেন, বাস্। তোমার জিনিস তোমারই থাক। তোমাদের পরীক্ষা লওয়া হইল। আল্লাহ তোমার উপর খুশি হইয়াছেন, আর তাহাদের উপর বেজার হইয়াছেন।

শব্দার্থ ও টীকা

ধবল – সাদা। শ্বেত। এক প্রকার চর্মরোগ– এই রোগে শরীরে চামড়া ও চুল সাদা হয়ে যায়।

গাভিন – গর্ভধারণ করেছে এমন (গাভিন গরু)।

আমির – ধনী। ধনবান।

সর্বাঙ্গে – (সর্ব+অঙ্গ>সর্বাঙ্গ+এ বিভক্তি) সারা শরীরে। সমস্ত দেহে।

কসম – শপথ। দিব্যি।

স্বর্গীয় দূত – আল্লাহর বার্তা বাহক। সংবাদবাহক।

নূর – জ্যোতি। আলো।

পুঁজি – সম্বল। মূলধন।

দোহাই – শপথ। কসম।

সম্বল – পাথেয়। পুঁজি।

বেজার – অখুশি। অসন্তুষ্ট।

পাঠের উদ্দেশ্য

সততা, পরোপকার ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জন।

পাঠ-পরিচিতি

সাধুরীতিতে রচিত এই গল্পে হাদিসের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এই গল্পের মূল বাণী হচ্ছে আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন এবং সৎলোককে যথাযথ পুরস্কার দেন।

আরব দেশের তিন জন লোককে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ একজন ফেরেশতা পাঠান। এদের একজন ধবলরোগী একজন টাকওয়ালা এবং আরেকজন অন্ধ।

ফেরেশতার অনুগ্রহে এই তিন জনেরই শারীরিক ত্রুটি দূর হলো। তিন জনই সুন্দর সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের চেহারা পেল। শুধু তাই নয়, ফেরেশতার কৃপায় প্রথম জন একটি উট থেকে বহু উটের, দ্বিতীয় জন একটি গাভি থেকে বহু গাভির এবং তৃতীয় জন একটি ছাগল থেকে বহু ছাগলের মালিক হয়ে গেল।

কিছুদিন পর এদের পরীক্ষা করার জন্য ফেরেশতা গরিব বিদেশির ছদ্মবেশে এদের কাছে হাজির হলেন। তিনি একেক জনের কাছে গিয়ে তাদের আগের দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে কিছু সাহায্য করতে বললেন। প্রথম দুজন তাদের আগের অবস্থার কথা অস্বীকার করে ছদ্মবেশী ফেরেশতাকে খালি হাতে বিদায় দিল। অন্যদিকে তৃতীয় জন নির্দ্বিধায় ফেরেশতার ইচ্ছেমতো সবকিছু দিতে রাজি হল। আল্লাহ তার উপর খুশি হলেন এবং তার সম্পদ তারই রয়ে গেল। প্রথম দুজনের উপর আল্লাহ অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাদের অবস্থা আগের মতো হয়ে গেল। অকৃতজ্ঞরা তাদের অকৃতজ্ঞতার উপযুক্ত ফল পেল।

লেখক-পরিচিতি

মুহম্মদ শহীদুল্লাহর জন্ম ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার পেয়ারা গ্রামে। তিনি বহুভাষাবিদ ও পণ্ডিত হিসেবে খ্যাত। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কলকাতা সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে বিএ অনার্স ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে এমএ পাস করেন। তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের প্রথম ছাত্র। পরে তিনি প্যারিসের সোরবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব লিটারেচার ডিগ্রি লাভ করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা ব্যাকরণ রচনাতেও তাঁর অবদান স্মরণীয়।

কর্মজীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। ছোটদের জন্য তাঁর লেখা রচনাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– 'শেষ নবীর সন্ধানে' ও 'গল্প মঞ্জুরী'। তাঁর সম্পাদনায় শিশু-পত্রিকা 'আঙুর' প্রকাশিত হয়। 'বাংলা ভাষার আঞ্চলিক অভিধান' সম্পাদনা তাঁর অসামান্য কীর্তি।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হল প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ফেরেশতা কেন আরব দেশের লোকদের কাছে এসেছিলেন?

ক. সাহায্য নেওয়ার জন্য   খ. পরীক্ষা নেওয়ার জন্য

গ. শিক্ষা দেওয়ার জন্য   ঘ. মূল্যায়নের জন্য

২. অন্ধ ব্যক্তি ফেরেশতাকে সবকিছু দিতে রাজি হয়েছিল কেন?

ক. আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকায়   খ. তার ছাগল বেশি হয়েছিল

গ. তার আর ধনসম্পদের দরকার ছিল না   ঘ. সে অকৃপণ ছিল

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

কাজিপাড়া গ্রামের নওশাদ পরোপকারী মানুষ। এইতো সেদিন প্রতিবেশী কাশিমের বাড়িতে আগুন লাগলে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাশিমকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে নওশাদ। এর কিছুদিন পর নওশাদ একটি দুর্ঘটনায় হাসপাতালে যখন চিকিৎসাধীন তখন কাশিম নিজের রক্ত দিয়ে নওশাদকে সুস্থ করে তোলেন।

৩. উদ্দীপকের কাশিমের সাথে 'সততার পুরস্কার' গল্পের কার সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. ধবলরোগী

খ. টাকওয়ালা

গ. অন্ধলোক

ঘ. বিদেশি

৪. উদ্দীপকের কাশিমের সাথে 'সততার পুরস্কার' গল্পের যে দিকটি প্রকাশ পেয়েছে তা হলো–

i. নৈতিক মূল্যবোধ
ii. পরোপকার
iii. কৃতজ্ঞতাবোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

কালাম, আবুল ও হাফিজ একই গ্রামে বাস করে। তাদের অবস্থা তেমন ভালো নয়। কোনো মতে দিন অতিবাহিত করে। এ কারণে হাজি সাহেব তার যাকাতের টাকা দিয়ে আবুলকে একটা রিক্সা, কালামকে একটা ভ্যানগাড়ি আর হাফিজকে একটা সেলাই মেশিন কিনে দিলেন। তিনি বললেন, তোমরা পরিশ্রম করে খাও, আর তোমাদের সাধ্যমতো গরিব মানুষের উপকার করো। কিছুদিন পর হাজি সাহেব তাদের পরীক্ষা করার জন্য এক ভিক্ষুককে পাঠালেন তাদের কাছে সাহায্য চাইতে। আবুল আর কালাম কোনো সাহায্যই করলো না। কিন্তু হাফিজ বিনা পয়সায় ভিক্ষুকের জামাটা সেলাই করে দিল।

ক. স্বর্গীয় দূত কতজন ইহুদিকে পরীক্ষা করেছিলেন?

খ. স্বর্গীয় দূত মানুষের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন কেন?

গ. কালাম ও আবুলের কাজের মধ্যে 'সততার পুরস্কার' গল্পের যে দিকটি প্রতিফলিত তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "হাফিজের কাজের মধ্যেই 'সততার পুরস্কার' গল্পের মূল শিক্ষা নিহিত"— কথাটি বিশ্লেষণ কর।

মিনু

বনফুল

মা-মরা মেয়ে মিনু। বাবা জন্মের আগেই মারা গেছে। সে মানুষ হচ্ছে এক দূরসম্পর্কের পিসিমার বাড়িতে। বয়স মাত্র দশ, কিন্তু এই বয়সেই সবরকম কাজ করতে পারে সে। সবরকম কাজই করতে হয়। লোকে অবশ্য বলে যোগেন বসাক মহৎ লোক বলেই অনাথা বোবা মেয়েটাকে আশ্রয় দিয়েছেন। মহৎ হয়ে সুবিধাই হয়েছে যোগেন বসাকের। পেটভাতায় এমন সর্বগুণান্বিতা চব্বিশ ঘণ্টার চাকরানী পাওয়া শক্ত হতো তাঁর পক্ষে। বোবা হওয়াতে আরো সুবিধা হয়েছে, নীরবে কাজ করে। মিনু শুধু বোবা নয়, ঈষৎ কালাও। অনেক চেঁচিয়ে বললে, তবে শুনতে পায়। সব কথা শোনার দরকারও হয় না তার। ঠোঁটনাড়া আর মুখের ভাব দেখেই সব বুঝতে পারে। এছাড়া তার আর একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে যার সাহায্যে সে এমন সব জিনিস বুঝতে পারে, এমন সব জিনিস মনে মনে সৃষ্টি করে, সাধারণ বুদ্ধিতে যার মানে হয় না। মিনুর জগৎ চোখের জগৎ, দৃষ্টির ভিতর দিয়েই সৃষ্টিকে গ্রহণ করেছে সে। শুধু গ্রহণ করে নি, নতুন রূপে নতুন রং আরোপ করেছে তাতে।

খুব ভোরে ওঠে সে। ভোর চারটের সময়। উঠেই দেখতে পায় পূর্ব আকাশে দপদপ করে জ্বলছে শুকতারা। পরিচিত বন্ধুকে দেখলে মুখে যেমন মৃদু হাসি ফুটে ওঠে, তেমনি হাসি ফুটে ওঠে মিনুর মুখেও। মিনু মনে মনে বলে—সই ঠিক সময়ে উঠেছ দেখছি। বৈজ্ঞানিকের চোখে শুকতারা বিরাট বিশাল বাষ্পমণ্ডিত প্রকাণ্ড গ্রহ, কবির চোখে নিশাবসানের আলোকদূত, কিন্তু মিনুর চোখে সে সই। মিনুর বিশ্বাস সে-ও তার মতো কয়লা ভাঙতে উঠেছে ভোর বেলায়, আকাশবাসী তার কোনো পিসেমশায়ের গৃহস্থালিতে উনুন ধরাবার জন্যে। আকাশের পিসেমশায়ও হয়তো ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করে তার নিজের পিসেমশায়ের মতো। শুকতারার

আশেপাশে কালো মেঘের টুকরো যখন দেখতে পায়, তখন ভাবে ঐ যে কয়লা। কী বিচ্ছিরি করে ছড়িয়ে রেখেছে আজ। বলে আর মুচকি মুচকি হাসে। তারপর নিজে যায় সে কয়লা ভাঙতে। কয়লাগুলো ওর শত্রু। শত্রুর উপর হাতুড়ি চালিয়ে ভারি তৃপ্তি হয় ওর। হাতুড়িটার নাম রেখেছে গদাই, আর যে পাথরটার উপর রেখে কয়লা ভাঙে তার নাম দিয়েছে শানু। শানের সঙ্গে মিল আছে বলে বোধ হয়। কয়লা-গাদার কাছে গিয়ে রোজ সে ওদের মনে মনে ডাকে—ও গদাই ও শানু ওঠো এবার, রাত যে পুইয়ে গেছে। সই এসে কয়লা ভাঙছে। তোমরাও ওঠো, কয়লা ভেঙে তারপর যায় সে ঘুঁটের কাছে। ঘুঁটে তার কাছে ঘুঁটে নয়,তরকারি। উনুনের নাম রাক্ষসী। উনুন রাক্ষসী কেরোসিন তেল দেওয়া ঘুঁটের তরকারি দিয়ে শত্রুদের মানে কয়লাদের খাবে। আঁচটা যখন গনগন করে ধরে ওঠে তখন ভারি আনন্দ হয় মিনুর। জ্বলন্ত কয়লাগুলোকে তার মনে হয় রক্তাক্ত মাংস, আর আগুনের লাল আভাকে মনে হয় রাক্ষসীর তৃপ্তি। বিস্ফারিত নয়নে সে চেয়ে থাকে। তারপর ছুটে চলে যায় উঠোনে; আকাশের দিকে চেয়ে দেখে সেখানে উষার লাল আভা ফুটছে কি না। উষার লাল আভা যেদিন ভালো করে ফোটে সেদিন সে ভাবে সইয়ের উনুনে চমৎকার আঁচ এসেছে। যেদিন আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে সেদিন ভাবে, ছাই পরিষ্কার করে নি, তাই আঁচ ওঠে নি আজ। এইভাবে নিজের একটা অভিনব জগৎ সৃষ্টি করেছে সে মনে মনে। সে জগতের সঙ্গে বাইরের জগতের মিল নেই। সে জগতে তার শত্রু-মিত্র সব আছে। আগেই বলেছি কয়লা তার শত্রু। রান্নাঘরের বাসনগুলি সব তার বন্ধু। তাদের নাম রেখেছে সে আলাদা আলাদা। ঘটিটার নাম পুটি। ঘটিটা একদিন হাত থেকে পড়ে গিয়ে তুবড়ে গেল। মিনুর সে কী কান্না! তোবড়ানো জায়গাটায় রোজ হাত বুলিয়ে দেয়। গেলাস চারটের নাম হাবু, বাবু, তাবু আর কাবু। চারটে গেলাসই একরকম। কিন্তু মিনুর

চোখে তাদের পার্থক্য ধরা পড়ে। গেলাসগুলোকে যখন মাজে বা ধোয় তখন মনে হয় সে যেন ছোট ছেলেদের স্নান করাচ্ছে। মিটসেফটা ওর শত্রু। ওটার নাম দিয়েছে গপগপা। গপগপ করে সব জিনিস পেটে পুরে নেয়। মাঝে মাঝে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে মিটসেফের চকচকে তালাটার দিকে, আর মনে মনে বলে—আ মর, মুখপোড়া সব জিনিস পেটে পুরে বসে আছে। মিনুর আর একটি দৈনন্দিন কর্তব্য আছে। যখন অবসর পায় টুক করে চলে যায় ছাদে। ছাদ থেকে একটা বড় কাঁঠাল গাছ দেখা যায়। কাঁঠাল গাছের মাথার দিক থেকে একটা সরু শুকনো ডাল বেরিয়ে আছে। সেই ডালটার দিকে সাগ্রহে চেয়ে থাকে মিনু। মনে হয় তার সমস্ত অন্তর যেন তার দৃষ্টিপথে বেরিয়ে গিয়ে আশ্রয় করেছে ওই ডালটাকে। এর কারণ আছে। তার

জন্মের পূর্বেই তার বাবার মৃত্যু হয়েছিল। বাবাকে সে দেখে নি। অনেকদিন আগে তার মাসিমা তার কানের কাছে চিৎকার করে একটা বিস্ময়কর খবর বলেছিল। তার বাবা নাকি বিদেশ গেছে, অনেক দূর বিদেশ, মিনু বড় হলে তার কাছে ফিরে আসবে, হয়তো তার কোলেই আসবে। মিনু বুঝতে পারে নি ব্যাপারটা ভালো করে। একটা জিনিস কেবল তার মনে গাঁথা হয়ে ছিল, বাবা ফিরে আসবে। কবে আসবে? মিনু কত বড় হলে আসবে? কথাটা মাঝে মাঝে ভাবত সে।

এমন সময় একদিন একটা ঘটনা ঘটল। সে সেদিনও ছাদে দাঁড়িয়েছিল। দেখতে পেল পাশের বাড়ির টুনুর বাবা এলো বিদেশ থেকে অনেক জিনিসপত্র নিয়ে, আর ঠিক সেই সময়ে তার নজরে পড়ল ঐ সরু ডালটায় একটা হলদে পাখিও এসে বসল। সেদিন থেকে তার বদ্ধ ধারণা হয়ে গেছে ওই সরু ডালে যেদিন হলদে পাখি এসে আবার বসবে, সেদিনই তার বাবা আসবে বিদেশ থেকে। তাই ফাঁক পেলেই সে ছাদে ওঠে। কাঁঠাল গাছের ওই সরু ডালটার দিকে চেয়ে থাকে। হলদে পাখি কিন্তু আর এসে বসে না। তবু রোজ একবার ছাদে ওঠে মিনু। এটা তার দৈনন্দিন কর্তব্যের মধ্যে একটা। এর কয়েকদিন পর রাত্রে কম্প দিয়ে জ্বর এলো তার। কাউকে কিছু বললে না। মনে হলো জ্বর হওয়াটাও বুঝি অপরাধ একটা। ভোরে ঘুম ভেঙে গেল, রোজ যেমন কয়লা ভাঙতে যায় সেদিনও তেমনি গেল, সেদিনও চোখে পড়ল শুকতারাটা দপদপ করে জ্বলছে। মনে মনে বলল— সই এসেছিস। আমার শরীরটা আজ ভালো নেই ভাই। তুই ভালো আছিস তো? উনুনে আঁচ দিয়ে কিন্তু সে আর জল ভরতে পারল না সেদিন। শরীরটা বড্ড বেশি খারাপ হতে লাগল। আস্তে আস্তে গিয়ে শুয়ে পড়ল নিজের বিছানায়। কেমন যেন ঘোর-ঘোর মনে হতে লাগল। নিজের ছোট্ট ঘরটিতে মিনু জ্বরের ঘোরে শুয়ে রইল খানিকক্ষণ। জ্বরের ঘোরেই হঠাৎ তার মনে হয় একটা দরকারি কাজ করা হয় নি। আস্তে আস্তে উঠল সে বিছানা থেকে, তারপর খিড়কির দরজা দিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ছাদের সিঁড়ির কাছে। সিঁড়ির কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে উঠে গেল ছাদে। কেউ দেখতে পেল না। পিসিমা পিসেমশাই তখনও ঘুমুচ্ছেন। ছাদে উঠেই চোখে পড়ল লালে লাল হয়ে গেছে পূর্বাকাশ। বাঃ চমৎকার আঁচ উঠেছে তো সইয়ের। একটু হাসল সে। তারপর চাইল সেই সরু ডালটার দিকে। সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল তার। একটা হলদে পাখি এসে বসেছে। তাহলে তো বাবা নিশ্চয় এসেছে। আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না ছাদে। যদিও পা টলছিল তবু সে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এলো বাইরে।

শব্দার্থ ও টীকা

পেটভাতায় — পেটেভাতে। প্রয়োজনীয় খাদ্যের বিনিময়ে।

কালা — বধির। কানে কম শোনে এমন।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় — চোখ, কান, নাক, জিভ, ত্বক—এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের বাইরে বিশেষ কিছু। অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি।

শুকতারা — সূর্যোদয়ের আগে পুব আকাশে এবং সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে নক্ষত্রের মতো দীপ্তিমান শুক্রগ্রহ।

গ্রহ — সূর্য প্রদক্ষিণকারী জ্যোতিষ্ক।

সই — সখির কথ্য রূপ। বান্ধবী। সহচরী।

আকাশবাসী — কল্পিত উর্ধ্বলোকে বসবাসকারী।

ডেলিপ্যাসেঞ্জারি — প্রত্যহ যাতায়াতকারী।

উনুন — চুলা।

মিটসেফ — রান্নাঘরে খাদ্য রাখার তাকবিশিষ্ট বাক্স।

খিড়কি — বাড়ির পেছনের ছোট দরজা।

রোমাঞ্চিত — পুলকিত। আনন্দিত।

পাঠের উদ্দেশ্য

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের প্রতি মমত্ববোধ জাগ্রত করা।

পাঠ-পরিচিতি

বিচিত্র মানুষের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের এ সমাজ। কেউ সুস্থ, কেউবা পুরো সুস্থ নয়। বাক্‌প্রতিবন্ধী মানুষও আমাদের সমাজে প্রায়ই দেখা যায়। ছোট্ট মেয়ে মিনু বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী। তার মা-বাবা নেই। তাই বলে জীবনকে সে তুচ্ছ মনে করে না। দূর-সম্পর্কীয় এক আত্মীয়ের বাসায় তাকে থাকতে হয়। সেখানে গৃহকর্মে তার অখণ্ড মনোযোগ। শুধু তাই নয়, প্রকৃতির সঙ্গেও সে মিতালি পাতিয়েছে। ভোরবেলাকার নতুন সূর্যকে নিজের জ্বালানো চুল্লির সঙ্গে তুলনা করতেই তার ভালো লাগে। হলদে পাখি দেখে তার মনে পুলক জাগে। পাশের বাসায় কোনো এক প্রবাসী পিতার আগমন লক্ষ করে সে মনে করে, একদিন তার বাবাও ফিরে আসবে। পিতার জন্য মনে মনে অপেক্ষা করে কিশোরী। হলদে পাখি আসে কিন্তু তার পিতা আসে না—এই কষ্ট তার একান্ত নিজস্ব। তবুও সে স্বপ্ন দেখে। এই স্বপ্নই তাকে সমস্ত প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে সাহায্য করে।

২০২৫

লেখক-পরিচিতি

বনফুলের প্রকৃত নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। তিনি ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের বিহারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পেশায় ছিলেন চিকিৎসক। বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে চাকরি করলেও সাহিত্যের প্রতি, তাঁর আগ্রহ ছিল ব্যাপক। তিনি তাঁর গল্পকে আকারে ছোট, ব্যঙ্গ-রসিকতায় পূর্ণ ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপনার মাধ্যমে সাহিত্যাঙ্গনে বিশেষ স্থান করে নিয়েছেন। বাস্তবজীবন, মানুষের সংবেদনশীলতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র উপাদানকে তিনি গল্পের বিষয় করেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হলো : 'বনফুলের গল্প', 'বাহুল্য', 'অদৃশ্যলোকে', 'বহুবর্ণ', 'অনুগামিনী' ইত্যাদি। তিনি বেশ কিছু উপন্যাস, নাটক আর কাব্যও লিখেছেন। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে 'পদ্মভূষণ' (ভারত) উপাধি প্রদান করা হয়। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে বনফুল কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

১. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন একজন শিশুকে নিয়ে গল্প, কবিতা বা সংক্ষিপ্ত রচনা লেখ। মনে রাখবে তুমি যা-ই লেখ না কেন শিশুটির প্রতি যেন মমত্ববোধ প্রকাশ পায়।

২. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রতি সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচারণার জন্য পোস্টার ও লিফলেট তৈরি কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মিনুর সই কে?

ক. চাঁদ   খ. সূর্য

গ. মঙ্গল গ্রহ   ঘ. শুকতারা

২. 'মিনুর বাবা অনেক দূর বিদেশ আছে'— এখানে 'দূর বিদেশে' বলতে কোনটিকে বোঝানো হয়েছে?

ক. গ্রহ   খ. আমেরিকা

গ. পরপার   ঘ. আকাশ

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

মায়ের ভালোবাসা পাবার প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা, মাকে না দেখার অব্যক্ত ব্যাকুলতা কলকাতায় থাকা ফটিকের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। শহরের অনাত্মীয় পরিবেশ থেকে বাঁচার জন্য মাঝে মধ্যে তার মন কেঁদে উঠে 'মা' 'মা' বলে। মায়ের কাছে ফিরে যাবার আশায় থেকে ফটিক একদিন সবার কাছ থেকে চিরদিনের ছুটি নিয়ে অসীমের পথে পাড়ি জমায়।

৩. উদ্দীপকটিতে 'মিনু' গল্পের যে বিষয়টি লক্ষ করা যায় তা হলো—

ক. আত্মীয়ের অনাদর অবহেলা খ. প্রিয়জনের প্রতি মমত্ববোধ
গ. প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ ঘ. শারীরিক অক্ষমতা

৪. উদ্দীপকটিতে মিনু ও ফটিকের পরিণতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—

i. স্বাভাবিকতা জীবনে অপরিহার্য

ii. প্রকৃতিই হলো শ্রেষ্ঠ আশ্রয়

iii. পারস্পরিক সহমর্মিতা জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বন্যা সারা সকাল মিসেস সালমার বাসায় কাজ করে, তাকে খালাম্মা বলে ডাকে। সে মিসেস সালমার যাবতীয় কাজে সাহায্য করার চেষ্টা করে। দিবা শাখার একটি মাদ্রাসায় সেও পড়ে। পড়ালেখায় সে পিছিয়ে নেই। শুধু প্রকৃতির কোনো কিছুর সঙ্গে তার সখ্য গড়ে ওঠে নি; সে সময়ই বা তার কোথায়? তার নিজের জীবন আর কাজ নিয়েই সে ব্যস্ত। প্রকৃতিতে নয়, নিজের কাজেই সে শান্তি খুঁজে পায়। বন্যা তার কাজ দিয়ে, কথা দিয়ে মিসেস সালমাকে এমন করে নিয়েছে যে মিসেস সালমাও বন্যাকে পরিবারের অন্য সদস্যের মতোই মনে করে।

ক. মিনু কার বাড়িতে থাকত?

খ. ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. অবস্থানগত দিক থেকে উদ্দীপকের বন্যা ও মিনুর মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়, তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'বন্যার শিক্ষা ছিল প্রাতিষ্ঠানিক, আর প্রকৃতি হচ্ছে মিনুর পাঠশালা'– কথাটি বিশ্লেষণ কর।

নীল নদ আর পিরামিডের দেশ

সৈয়দ মুজতবা আলী

সন্ধ্যের দিকে জাহাজ সুয়েজ বন্দরে পৌঁছল।

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ঘন নীলাকাশ কেমন যেন সূর্যের লাল আর নীল মিলে বেগুনি রং ধারণ করছে। ভূমধ্যসাগর থেকে একশ মাইল পেরিয়ে আসছে মন্দমধুর ঠান্ডা হাওয়া।

সূর্য অস্ত গেল মিশর মরুভূমির পিছনে। সোনালি বালিতে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে সেটা আকাশের বুকে হানা দেয় এবং ক্ষণে ক্ষণে সেখানকার রং বদলাতে থাকে। তার একটা রং ঠিক চেনা কোন জিনিসের রং সেটা বুঝতে–না–বুঝতে সে রং বদলে গিয়ে অন্য জিনিসের রং ধরে ফেলে।

আমরা বন্দর ছেড়ে মরুভূমিতে ঢুকে গিয়েছি। পিছনে তাকিয়ে দেখি, শহরের বিজলি বাতি ক্রমেই নিষ্প্রভ হয়ে আসছে।

মরুভূমির উপর চন্দ্রালোক। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। সে দৃশ্য বাংলাদেশের সবুজ শ্যামলিমার মাঝখানে দেখা যায় না। সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন ভূতুড়ে বলে মনে হয়। চলে যাচ্ছে দূর দিগন্তে,অথচ হঠাৎ যেন ঝাপসা আবছায়া পর্দায় ধাক্কা খেয়ে থেমে যায়।

মাঝে মাঝে আবার হঠাৎ মোটরের দুমাথা উঁচুতে ওঠে। জ্বলজ্বল দুটি ছোট সবুজ আলো। ওগুলো কী? ভূতের চোখ নাকি? শুনেছি ভূতের চোখই সবুজ রঙের হয়। না! কাছে আসতে দেখি উটের ক্যারাভান–এদেশের ভাষাতে যাকে বলে 'কাফেলা'।

উটের চোখের উপর মোটরের হেডলাইট পড়াতে চোখদুটো সবুজ হয়ে আমাদের চোখে ধরা দিয়েছে। ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। আর কেনই পাব না বলো? মরুভূমি সম্বন্ধে কতো গল্প, কতো সত্য, কতো মিথ্যে পড়েছি ছেলেবেলায়। তৃষ্ণায় সেখানে বেদুইন মারা যায়, মৃত্যু থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য বেদুইন তার পুত্রের চেয়ে প্রিয়তর উটের গলা কাটে, উটের জমানো জল খায় প্রাণ বাঁচাবার জন্য।

যদি মোটর ভেঙে যায়? যদি কাল সন্ধ্যে অবধি এ রাস্তা দিয়ে আর কোনো মোটর না আসে? স্পষ্ট দেখতে পেলুম এ গাড়ি রওনা হওয়ার পূর্বে পাঁচশ গ্যালন জল সঙ্গে তুলে নেয় নি, তখন কী হবে উপায়? মরুভূমির ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। জাহাজে চড়ার সময় কি কল্পনা করতে পেরেছিলুম, জাহাজে চড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফোকটে মরুভূমির ভিতর দিয়ে চলে যাব?

কতোক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম মনে নেই। যখন মোটরের হঠাৎ একটুখানি জোর ঝাঁকুনিতে ঘুম ভাঙল তখন দেখি চোখের সামনে সারি সারি আলো। কায়রো পৌঁছে গিয়েছি।

শহরতলিতে ঢুকলাম। খোলা জানালা দিয়ে সারি সারি আলো দেখা যাচ্ছে। এই শহরতলিতেই কতো না রেস্তোঁরা, কতো না ক্যাফে খোলা, খদ্দেরে খদ্দেরে গিসগিস করছে। রাত তখন এগারটা। আমি বিস্তর বড় বড় শহর দেখেছি। কায়রোর মতো নিশাচর শহর কোথাও চোখে পড়ে নি। কায়রোর রান্নার খুশবাইয়ে রাস্তা ম–ম করছে। মাঝে মাঝে নাকে এসে এমন ধাক্কা লাগায় যে মনে হয় নেমে পড়ে এখানেই চাট্টি খেয়ে যাই। অবশ্য রেস্তোঁরাগুলো আমাদের পাড়ার দোকানের মতো নোংরা।

সবাই নিকটতম রেস্তোঁরায় হুড়মুড় করে ঢুকলুম। কারণ সবাই তখন ক্ষুধায় কাতর। তড়িঘড়ি তিনখানি ছোট ছোট টেবিল একজোড় করে চেয়ার সাজিয়ে আমাদের বসবার ব্যবস্থা করা হলো, রান্নাঘর থেকে স্বয়ং বাবুর্চি ছুটে এসে তোয়ালে কাঁধে বারবার ঝুঁকে ঝুঁকে সেলাম জানালো।

মিশরীয় রান্না ভারতীয় রান্নার মামাতো বোন – অবশ্য ভারতীয় মোগলাই রান্নার। বারকোশে হরেক রকম খাবারের নমুনা। তাতে দেখলুম, রয়েছে মুরগি মুসল্লম, শিক কাবাব, শামি কাবাব আর গোটা পাঁচ–ছয় অজানা জিনিস। আমার প্রাণ অবশ্য তখন কাঁদছিল চারটি আতপ চাল, উচ্ছেভাজা, সোনামুগের ডাল, পটলভাজা আর মাছের ঝোলের জন্য। অত–শত বলি কেন? শুধু ঝোল–ভাতের জন্য। কিন্তু ওসব জিনিস তো আর বাংলাদেশের বাইরে পাওয়া যায় না, কাজেই শোক করে কী লাভ?

আহারাদি সমাপ্ত করে আমরা ফের গাড়িতে উঠলুম। ততক্ষণে আমরা কায়রো শহরের ঠিক মাঝখানে ঢুকে গিয়েছি। গন্ডায় গন্ডায় রেস্তোঁরা, হোটেল, সিনেমা, ডানস্ হল, ক্যাবারে। খদ্দেরে তামাম শহরটা আবজাব করছে। কতো জাত–বেজাতের লোক।

ঐ দেখ, অতি খানদানি নিগ্রো। ভেড়ার লোমের মতো কোঁকড়া কালো চুল, লাল লাল পুরু দুখানা ঠোঁট, বোঁচা নাক, ঝিনুকের মতো দাঁত আর কালো চামড়ার কী অসীম সৌন্দর্য। আমি জানি এরা তেল মাখে না। কিন্তু আহা, ওদের সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন তেল ঝরছে।

ঐ দেখ, সুদানবাসী। সবাই প্রায় ছফুট লম্বা। আর লম্বা আলখাল্লা পরেছে বলে মনে হয়। দৈর্ঘ্য ছফুটের চেয়েও বেশি। এদের রং ব্রোঞ্জের মতো। এদের ঠোঁট নিগ্রোদের মতো পুরু নয়, টকটকে লালও নয়।

কায়রোতে বৃষ্টি হয় দৈবাৎ। তাও দু এক ইঞ্চির বেশি নয়। তাই লোকজন সব বসেছে হোটেল কাফের বারান্দায় কিংবা চাতালে। শুনলাম, এখানকার বায়স্কোপও বেশির ভাগ হয় খোলামেলাতে।

মোটর গাড়ি বড্ড তাড়াতাড়ি চলে বলে ভালো করে সব কিছু দেখতে পেলুম না। কিন্তু এইবার চোখের সামনে ভেসে উঠল অতি রমণীয় এক দৃশ্য। নাইল–নীল নদ।

চাঁদের আলোতে দেখছি, নীলের উপর দিয়ে চলেছে মাঝারি ধরনের খোলা মহাজনি নৌকা–হাওয়াতে কাত হয়ে তেকোণা পাল পেটুক ছেলের মতো পেট ফুলিয়ে দিয়ে। ভয় হয়, আর সামান্য একটুখানি জোর হাওয়া বইলেই, হয় পালটা এক ঝটকায় চৌচির হয়ে যাবে, নয় নৌকাটা পিছনে ধাক্কা খেয়ে গোটা আড়াই ডিগবাজি খেয়ে নীলের অতলে তলিয়ে যাবে।

এই নীলের জল দিয়ে এদেশের চাষ হয়। এই নীল তার বুকে ধরে সে চাষের ফসল মিশরের সর্বত্র পৌঁছে দেয়।

পিরামিড! পিরামিড!! পিরামিড!!!

চোখের সামনে দাঁড়িয়ে তিনটে পিরামিড? এই তিনটে পিরামিড পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো কীর্তিস্তম্ভ। যুগ যুগ ধরে মানুষ এদের সামনে দাঁড়িয়ে বিস্তর জল্পনা–কল্পনা করেছে, দেয়ালে খোদাই এদের লিপি উদ্ধার করে এদের সম্বন্ধে পাকা খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছে।

মিশরের ভিতরে–বাইরে আরও পিরামিড আছে। কিন্তু গিজে অঞ্চলের যে তিনটি পিরামিডের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে, সেগুলোই ভুবনবিখ্যাত, পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম।

প্রায় পাঁচশ ফুট উঁচু বলে, না দেখে চট করে পিরামিডের উচ্চতা সম্বন্ধে ধারণা করা যায় না। এমন কি চোখের সামনে দেখেও ধারণা করা যায় না, এরা ঠিক কতোখানি উঁচু। চ্যাপ্টা আকারের একটা বিরাট জিনিস আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে পাঁচশ ফুট উঁচু না হয়ে যদি চোঙ্গার মতো একই সাইজ রেখে উঁচু হতো, তবে স্পষ্ট বোঝা যেত পাঁচশ ফুটের উচ্চতা কতোখানি উঁচু।

বোঝা যায়, দূরে চলে গেলে। গিজে এবং কায়রো ছেড়ে বহুদূরে চলে যাওয়ার পর হঠাৎ চোখে পড়ে তিনটি পিরামিড– সব কিছু ছাড়িয়ে, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে।

তাই বোঝা যায়, এ বস্তু তৈরি করতে কেন তেইশ লক্ষ টুকরো পাথরের প্রয়োজন হয়েছিল। 'টুকরো' বলতে একটু কমিয়ে বলা হলো, কারণ এর চার–পাঁচ টুকরো একত্রে করলে একখানা ছোট–খাট ইঞ্জিনের সাইজ এবং ওজন হয়। কিংবা বলতে পার, ছ ফুট উঁচু এবং তিন ফুট চওড়া করে এ পাথর দিয়ে একটা দেয়াল বানালে সে দেয়াল লম্বায় ছশ পঞ্চাশ মাইল হবে।

সবচেয়ে বড় পিরামিডটা বানাতে নাকি এক লক্ষ লোকের বিশ বৎসর লেগেছিল। ফারাওরা (সম্রাটরা) বিশ্বাস করতেন, তাদের শরীর যদি মৃত্যুর পর পচে যায় কিংবা কোনো প্রকারের আঘাতে ক্ষত হয়, তবে তাঁরা পরলোকে অনন্ত জীবন পাবেন না। তাই মৃত্যুর পর দেহকে 'মমি' বানিয়ে সেটাকে এমন একটা শক্ত পিরামিডের ভিতর রাখা হতো যে, তার ভিতর ঢুকে কেউ যেন মমিকে ছুঁতে পর্যন্ত না পারে।

নিদ্রিতের চোখে যে রকম পড়ে, আমার চোখে ঠিক তেমনি এসে পড়লো পশ্চিমাকাশ থেকে চন্দ্রাস্তের রক্তচ্ছটা আর পূর্বাকাশ থেকে নব অরুণোদয়ের পূর্বাভাস।

রাস্তা ক্রমেই সরু হয়ে আসছে। রাস্তায় দুদিকে দোকানপাট এখনও বন্ধ। দু একটা কফির দোকান খুলি খুলি করছে। ফুটপাতে লোহার চেয়ারের উপর পদ্মাসনে বসে দু-চারটি সুদানি দারোয়ান তসবি জপছে, খবরের কাগজগুলোর দোকানের সামনে অল্প একটু ভিড়।

তরল অন্ধকার সরল আলোর জন্য ক্রমেই জায়গা করে দিচ্ছে। আধো ঘুমে আধো জাগরণে জড়ানো হয়ে সব কিছুই যেন কিছু কিছু দেখা হলো। সবচেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছিল মসজিদের মিনারগুলোকে। এদের বহু মিনার দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহর নামাজের ঘর মসজিদের উপর। মসজিদে যে নিপুণ মোলায়েম কারুকার্য আছে সে রকম করবার মতো হাত আজকের দিনে কারও নেই।

প্রকৃতির গড়া নীল, আর মানুষের গড়া পিরামিডের পরেই মিশরের মসজিদ ভুবন বিখ্যাত এবং সৌন্দর্যে অতুলনীয়। পৃথিবীর বহু সমঝদার শুধু এই মসজিদগুলোকেই প্রাণভরে দেখবার জন্য সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে কায়রোতে আসেন।

(সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত)

শব্দার্থ ও টীকা

নিষ্প্রভ — দীপ্তিহীন। নিস্তেজ।

ভূতুড়ে — ভূত-প্রেত সম্পর্কিত। রহস্যময়।

ক্যারাভান — কাফেলা।

বেদুইন — আরবের একটি যাযাবর জাতি।

নিষ্কৃতি — নিস্তার। রেহাই। অব্যাহতি।

ফোকটে — ফাঁকতালে।

রেস্তোরাঁ — হোটেল বিশেষ।

হুড়মুড় — ঠেলাঠেলি করে ঢোকা বা বের হওয়ার ভাব নির্দেশক।

বারকোশ — কাষ্ঠনির্মিত কানা উঁচু বড় থালা।

গন্ডা — চারটি।

ক্যাবারে — নাচঘরে।

তামাম — সমস্ত। পুরো।

আবজাব — গিজগিজ। ঠাসাঠাসি।

জাত-বেজাত — নানা জাতি।

খানদানি — বংশমর্যাদাযুক্ত। অভিজাত। উচ্চবংশীয়।

আল্লখাল্লা — লম্বা ঢিলা জামা বিশেষ।

দৈবাৎ — সহসা, হঠাৎ।

অতি রমণীয় — খুব সুন্দর।

কীর্তিস্তম্ভ — মহৎ অবদান স্মরণে নির্মিত সৌধ।

মমি — কৃত্রিমভাবে সংরক্ষিত মৃতদেহ।

চন্দ্রাস্ত — চাঁদের অস্ত যাওয়া।

অরুণোদয় — সূর্যের উদয়।

পূর্বাভাস — ভাবী ঘটনার সংকেত। যা ঘটবে তার সংকেত।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীদের ভ্রমণে আগ্রহী করে তোলা এবং অন্য দেশের ইতিহাস-সংস্কৃতি সম্পর্কে জানানো।

পাঠ-পরিচিতি

বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতাগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে মিশর। প্রাচীন কাল থেকে মিশরের নীল নদকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল ঐ সভ্যতা। মিশরের আবহাওয়া শুষ্ক বলে ঐ সভ্যতার অনেক নিদর্শন কালের কবলে হারিয়ে যায়নি। উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার এই দেশটির বিশেষ করে কায়রো শহরের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে পঠিত রচনায়। রচনাটি সৈয়দ মুজতবা আলীর 'জলে ডাঙ্গায়' গ্রন্থ থেকে সংক্ষিপ্ত ও পরিমার্জন করে সংকলন করা হয়েছে।

এই রচনায় এসেছে চারদিকে মরুভূমি-ঘেরা ঐতিহাসিক কায়রো শহর, কায়রোর অদূরে গিজে অঞ্চলে অবস্থিত পিরামিড ও মিশরের ভুবন বিখ্যাত মসজিদের প্রসঙ্গ। এসবের আকর্ষণে সারা বিশ্বের পর্যটকরা ছুটে যায় কায়রো অভিমুখে। কায়রো শহর আলোয় ভরে যায় রাতের বেলায়। রেস্তোঁরাগুলো থেকে ভেসে আসা নানা রকম খাবার-দাবারের সুগন্ধ বাড়িয়ে দেয় পথচারীদের ক্ষুধা। অদূরেই গিজে শহরে রয়েছে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার আকর্ষণ ও পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের একটি মিশরের পিরামিড। পিরামিড নির্মিত হয়েছিল মিশরের প্রাচীন সম্রাট ফারাওদের মৃতদেহ মমি হিসেবে কবরস্থ করে রাখার জন্য। পাথরের চাঁই দিয়ে তৈরি বিশালাকার সমাধিস্তম্ভ এটি। নীলনদ আর পিরামিডের পরেই মিশরের অতুলনীয় আকর্ষণ হচ্ছে সেখানকার ভুবন বিখ্যাত অপূর্ব সৌন্দর্যের মসজিদগুলো। এসবের টানেই সমঝদার আর ভ্রমণপিপাসু মানুষ ছুটে যায় মিশরে।

লেখক-পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা ও অনন্য গদ্যশৈলীর স্রষ্টা সৈয়দ মুজতবা আলী। তাঁর জন্ম আসামের করিমগঞ্জে ১৯০৪ সালে। রবীন্দ্রনাথের স্নেহসান্নিধ্যে পাঁচ বছর লেখাপড়ার পর তিনি শান্তিনিকেতন থেকে স্নাতক হন। এছাড়া তিনি আলীগড় কলেজ, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় ও কায়রোর আল–আজহার বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যয়ন করেছেন।

মূলত রম্যরচয়িতা হিসেবে বাংলা সাহিত্যে খ্যাত এই লেখকের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে 'শবনম', 'দেশে বিদেশে', 'পঞ্চতন্ত্র', 'চাচা কাহিনী', 'জলে ডাঙ্গায়'।

তিনি ১৯৭৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. নীল নদ আর পিরামিডের দেশ ভ্রমণের একটি দৃশ্যচিত্র অঙ্কন কর।

খ. তিনশো শব্দের মধ্যে তোমার ব্যক্তিগত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লেখ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন দেশকে পিরামিডের দেশ বলা হয় ?

ক. সুদান খ. সৌদি আরব

গ. ইরান ঘ. মিশর

২. সৈয়দ মুজতবা আলী কায়রোকে 'নিশাচর শহর' বলেছেন কেন?

ক. রাতে আলোকিত শহর দেখতে পাওয়া যায় বলে

খ. কায়রোর রাস্তা খাবারের গন্ধে ম-ম করে বলে

গ. এমন চেহারার আর কোনো শহর দেখেন নি বলে

ঘ. রেস্তোরাঁ, ক্যাফেগুলো খদ্দেরে গিজগিজ করে বলে

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাংলাদেশের কুয়াকাটার নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে সকলেই মুগ্ধ হয়। এর সূর্যোদয়ের অপরূপ সৌন্দর্য, উষার আকাশ, আকাশের নজরকাড়া রং যেমন মন ছুঁয়ে যায়, তেমনি সূর্যাস্তের মোহময় বর্ণিল রূপও হাতছানি দিয়ে ডাকে।

৩. উদ্দীপকটি 'নীল নদ আর পিরামিডের দেশ' ভ্রমণকাহিনির সাথে কোন দিক থেকে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

খ. আলোর খেলা

গ. সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত

ঘ. সাগরপারের দৃশ্য

৪. উক্ত সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি মানুষের মনে–

i. প্রফুল্লতা আনে

ii. ভ্রমণবিলাসী করে

iii. কল্পনাবিলাসের জন্ম দেয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

ক. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আমরা কয়েকজন বন্ধু গ্রীষ্মের ছুটিতে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। উদ্দেশ্য ছিল, দুচোখ ভরে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করা। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম আবার সেখান থেকে কক্সবাজার গেলাম, সেখান থেকে সেন্ট মার্টিন, কী অপূর্ব দৃশ্য আর সৌন্দর্যের মাখামাখি। কোরাল পাথরের ছড়াছড়ি সেন্ট মার্টিনের এক বিশাল অহংকার। এছাড়াও আছে নীল পানির এক রাজপুরী। সেখানে কচ্ছপেরা অবাধে ঘুরে বেড়ায়, ডিম পাড়ে; কাঁকড়ারা দল বেঁধে আল্পনা আঁকে। সেন্ট মার্টিনে না গেলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই লীলাভূমি অদেখাই থেকে যেত।

ক. 'নীল নদ আর পিরামিডের দেশ' কার লেখা ?

খ. উটের চোখগুলো রাতের বেলা সবুজ দেখাচ্ছিল কেন?

গ. ভ্রমণকারীদের যাত্রাপথের সাথে লেখকের মিশর ভ্রমণের কী মিল খুঁজে পাওয়া যায়? বর্ণনা কর।

ঘ. 'সেন্ট মার্টিন না গেলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই লীলাভূমি অদেখাই থেকে যেত'– এই বক্তব্যটি 'নীল নদ আর পিরামিডের দেশ' রচনার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২. শ্রেয়সী তার বন্ধুদের নিয়ে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হলো। পদ্মা ও যমুনার রুপালি স্রোত পাড়ি দিয়ে তারা এক সময় ঢাকায় পৌঁছায়। সেখানে তারা প্রথমেই যায় লালবাগের দুর্গে। এ যেন ফেলে আসা মুঘল সাম্রাজ্যের একটুকরো রাজত্ব। মুঘল সম্রাটদের স্থাপত্য ঐশ্বর্য এখানে লুকিয়ে আছে। এখানকার দরবার হল, পরীবিবির মাজার ও শাহজাদা আজমের মসজিদ দেখে তারা ছবি তুলতে লাগলো। তারা শেষ পর্যন্ত স্বীকার করলো, এখানে আসার ফলেই তারা অতীত ইতিহাস ও সম্রাটের হারিয়ে যেতে বসা বিশাল কীর্তির সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছে।

ক. 'নীল নদ আর পিরামিডের দেশ' রচনাটি লেখকের কোন গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে?

খ. এই নীলের জল দিয়ে এ দেশের চাষ হয় –কেন?

গ. উদ্দীপকে 'নীল নদ আর পিরামিডের দেশ' রচনার যে দিকের সাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখা কর।

ঘ. 'উদ্দীপকের শ্রেয়সী ও তার বন্ধুদের ভ্রমণের উদ্দেশ্য যেন সৈয়দ মুজতবা আলীর চাওয়া।' মন্তব্যটি 'নীল নদ আর পিরামিডের দেশ' রচনার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

তোলপাড়

শওকত ওসমান
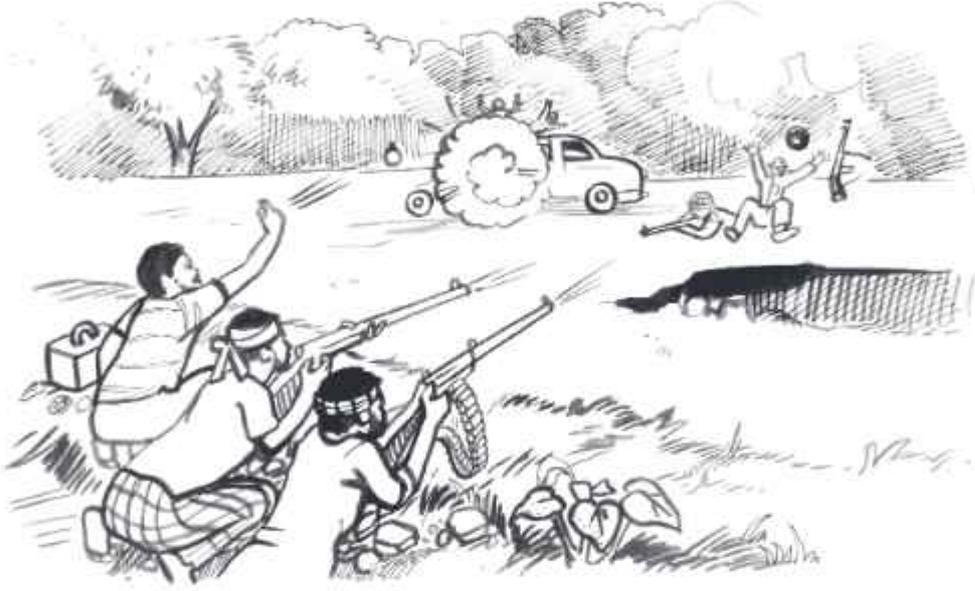
একদিন বিকেলে হন্তদন্ত সাবু বাড়ির উঠান থেকে 'মা মা' চিৎকার দিতে দিতে ঘরে ঢুকল। জৈতুন বিবি হকচকিয়ে যায়। রান্নাঘরে পাক করছিল সে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে শুধায়, কী রে—এত চিক্কর পাড়স ক্যান?

— মা, ঢাকা শহরে গুলি কইরা মানুষ মারছে–

— কে মারছে?

— পাঞ্জাবি মিলিটারি।

দেখা যায় সাবু খুব উত্তেজিত। মুখ দিয়ে কথা তাড়াতাড়ি বের করে দিতে চাইলেও পারে না। কারণ, শরীর থরথর কাঁপছে। হাতের মুঠি বারবার শক্ত হয়।

— মা, একজন দুজন না। হাজার হাজার মানুষ মারছে।

— কস কী, হাজার হাজার?

— হ, সব মানুষ শহর ছাইড়া চইলা আইতেছে।

ঢাকা শহর থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী গাবতলি গ্রাম। কিন্তু যাতায়াতের সুবিধা নেই। তাই সব খবরই দু-দিন বাদে এসে পৌঁছায়। এবার কিন্তু তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। পরদিনই পাওয়া গেছে সব খবর। যারা জওয়ান তারা সোজা হেঁটে হেঁটে বাড়ি পৌঁছেছে। তাই খবর ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয় নি। পঁচিশে মার্চের রাত্রে পাঞ্জাবি মিলিটারি ঝাঁপিয়ে পড়ে। জীবন্ত যাকে পাচ্ছে তাকেই হত্যা করছে।

পরদিন সাবুর সামনে গোটা শহর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে গেছে জেলা বোর্ডের সড়ক। সেই পথে মানুষ আসতে লাগল। একজন দুজন নয়, হাজার হাজার। একদম পিলপিল পিঁপড়ের সারি। গাবতলি গ্রাম তাদের গন্তব্য নয়। আরও দূরে যাবে তারা। কেউ কুমিল্লা, কেউ নোয়াখালি, কেউ ময়মনসিংহ—একদম গারো পাহাড়ের কাছাকাছি, আরও নানা এলাকায়।

দারুণ রোদ্দুর মাথার উপরে। আর ভিড়। নিশ্বাসে নিশ্বাসে তাপ বাড়ে। হাঁটার জন্য ক্লান্তি বাড়ে। সব মিলিয়ে জওয়ান মানুষেরাই খাবি খাচ্ছে। মেয়ে, শিশু এবং বেশি বয়সীদের তো কথাই নেই। ক্ষুধার কথা চুলোয় যাক, পিয়াসে ছাতি ফেটে দুতিন জন রাস্তার ধারেই শেষ হয়ে গেল।

জৈতুন বিবি মুড়ি ভেজে দিয়েছিল খুব ভোর-ভোর উঠে। সাবু চাঙারি বোঝাই করে মুড়ি এনে ওদের খাইয়েছে। নিজেরা কীভাবে চলবে সে কথা ভাবে নি। মুড়ি শেষ হলে সে পানি জোগানোর কাজে এগিয়ে গেছে।

এক প্রৌঢ় নারীকে দেখে সে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। পঞ্চাশের বেশি বয়স! কিন্তু কী ফরসা চেহারা! যেন কোনো ধলা পরি। মুখ দেখে বোঝা যায় অনেক হেঁটেছেন, অথচ তার জীবনে হাঁটার অভ্যেস নেই। সাবুর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

— মা, পানি খাবেন?

— দাও, বাবা। প্রৌঢ় নারী মুখ খুললেন। গ্লাস আবার ধুয়ে জালা থেকে পানি এগিয়ে দিয়েছিল সাবু। খালি গা। পরনে হাফপ্যান্ট, তাও ময়লা। বড় লজ্জা লাগে সাবুর। প্রৌঢ়া পানি খেয়ে তৃপ্ত। হাতে চামড়ার উপর নকশা-আঁকা ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন। তারপর একটা পাঁচ টাকার নোট সাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, বাবা, তুমি কিছু কিনে খেও।

— এ কী! না-না—

— নাও, বাবা।

— মাফ করবেন। টাকা নিলে আমারে মা বাড়ি থাইকা বাইর কইরা দিব। আমারে কইয়া দিছে, শহরের কত গণ্যমান্য মানুষ যাইব রাস্তা দিয়া! পয়সা দিলে নিবি না। খবরদার। সেই প্রৌঢ় নারী একটু হাঁফ ছেড়ে বললেন, তোমার মা কিছু বলবেন না।

— আমার মা-রে আপনি চেনেন না। মা কন, বিপদে পইড়া মানুষ বাড়ি আইলে কিছু লওয়া উচিত না। গরিব হইতাম পারি, কিন্তু আমরা জানোয়ার না।

শেষ কথাগুলোর পর নিরুপায় সেই নারী সাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, বাবা, যদি কখনো ঢাকা শহরে যাও, আমাদের বাড়িতে এসো।

— আপনাদের বাড়ি?

— লালমাটিয়া ব্লক ডি। আমি মিসেস রহমান।

মিসেস রহমান আবার রাস্তা ধরলেন। সাবু বুঝতে পারে, এই গরমে হাঁটার পক্ষে মোটা শরীর আদৌ আরামের নয়। বেচারা নিরুপায়। শরীর তো আর নিজে তৈরি করেন নি।

তিনি নিমেষে ভিড়ে মিশে গেলেন। ভিড় নয় স্রোত। শহর থেকে যে শুধু গণ্যমান্য মানুষ আসছে, তা নয়। সাধারণ মজুর-মিস্ত্রিরা পর্যন্ত আসছে। সাবু ভাবে, তা হলে শহরেও গরিব আছে, যারা তাদের মতোই কোনো রকমে দিন কাটায়, তাদেরই মতো যাদের ঠিকমতো বিশ্রাম জোটে না, আহার জোটে না, কাপড় জোটে না। এই সময় সাবুর আরো মনে হয়, একবার শহর দেখে এলে হতো। লোক তো শহর পর্যন্ত আছেই। এই জনস্রোত ধরে উজানে ঠেলে গেলেই সেখানে পৌঁছানো যাবে। কিন্তু তার সাহস হয় না।

একদিন তাদের গ্রামের পাশ দিয়ে গেল আট-নয় জনের একটি পরিবার। সম্ভ্রান্ত জন তারা। সত্তর বছরের বুড়ো তাদের সঙ্গে। তিনটি মাঝ-বয়সী মেয়ে—ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে বয়স—তাকে ধরে ধরে আনছে। সঙ্গে আরো পাঁচ-ছয়টি কুঁচো ছেলেমেয়ে, কেউ আট বছরের বেশি নয়। আর আছে লুঙ্গি পরা হাফ শার্ট পরিহিত জওয়ান একজন। তার চেহারা জানান দেয় বাড়ির চাকর। বুড়ো ঠিকমতো হাঁটতে পারে না। কখনো মেয়ে তিনটির সাহায্য নেয়, কখনো জওয়ান চাকরের! পাঁচ-ছটি কুঁচো ছেলেমেয়ের খবরদারিও সহজ নয়। কাজেই এই কাফেলা রীতিমতো নাজেহাল। আকাশে তেমনি কাঠফাটা রোদ।

শোনা গেল, বুড়োর তিন ছেলেকেই তার সামনে পাঞ্জাবি মিলিটারিরা গুলি করে মেরেছে। সঙ্গী মেয়ে তিনটি বিধবা বউ। কুঁচো ছেলেমেয়েগুলো বুড়োর নাতি-নাতনি।

গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে তারা বসেছিল। খবর জানার কৌতূহলে গাবতলি গাঁয়ের অনেকে ছুটে আসে। আজ কিন্তু কাছে এসে সবাই মিলে যায়। সদ্য বিধবা তিনজন। আর সঙ্গে অমন জয়িফ মানুষ। কেউ মিলিটারির জুলুমের খবর জানবার জন্য আগ্রহ দেখায় না। বরং কীভাবে এদের সাহায্য করতে পারে, তাই জিজ্ঞাসা করে।

পিয়াসে সকলেই অস্থির ছিল। কে একজন তাড়াতাড়ি ছোট কলস আর গ্লাস নিয়ে এলো। কিন্তু এই সামান্য আতিথেয়তায় কেউ সন্তুষ্ট নয়। সাবু নিজেও ভেবে পায় না কীভাবে উপকার করবে! আগে ফায়-ফরমাশ খাটতে কী বিরক্ত লাগত। আর এখন কিছু করতে না পারলে অসোয়াস্তি।

বুড়ো ভদ্রলোক রাজি ছিল না। তবু কয়েকজন উপযাচক হয়ে বিভিন্ন ভার নিল। সাবুও বাদ গেল না। সে একটা কচি ছেলেকে কোলে তুলে নিল। দুই মাইল দূরে নদীর ঘাট। সবাই মিলে পালা করে কাঁধে নিয়ে বুড়ো মানুষটিকে নদীর ঘাট পর্যন্ত দিয়ে আসবে। তারপর নৌকায় তুলে দেবে।

সাবুর কোলে গোলগাল বাচ্চাটা। বছর তিন বয়স। বেশ ভারি। কিন্তু ক্লান্তি নেই সাবুর। মাঝে মাঝে অন্য কেউ তার বোঝা হালকা করতে চাইলে সে বলে, আর একটু আগাইয়া দেই।

বৃদ্ধ আশেপাশের বাহকদের বলে, তোমরাই আমার ছেলে, বাবা। এই গরমে তোমরা ছাড়া কে আর এমন সাহায্য করত। ছেলে আর কোথায় পাব—

কথা শেষ হয় না, ফোঁপানির শব্দ ওঠে।

আবার বুড়োর ভাঙা ভাঙা গলা শোনা যায়, জীবনে নামাজ কাজা করি নি, বাবা। ইসলামের নাম নিয়ে বলল, পাকিস্তান হলে মুসলমানদের মঙ্গল হবে। হা—এই বয়সে সব ছেলেদের হারিয়ে—বুড়ো কথা শেষ করতে পারে না। দীর্ঘশ্বাস শোনা যায় শুধু।

সমস্ত কাফেলা নীরব। নারীদের মধ্যে একজন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করেছিল। তখনই থেমে গেল। কে আর কথা বলবে এমন জায়গায়। মনে হচ্ছিল, কতগুলো লাশ নিয়ে যেন সবাই হাঁটছে।
সাবু কল্পনার চোখে যেন সামনে দেখতে পায় :

খাকি উর্দি পরা কতগুলো সিপাই তার সামনে। আর সে তাদের লাথি মেরে মেরে ফুটবলের মতো গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অসীম আক্রোশে তার রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে। সেই সব দুশমন কখনও দেখে নি সে। সেই সব জানোয়ার কখনও দেখে নি সে, যারা তার দেশের মানুষকে বন্যার দিনের পিঁপড়ের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জুলুমের দাপটে।
অমন জন্তুদের মোকাবিলার জন্য তার কিশোর বুকে আশ্চর্য তোলপাড় শুরু হয়ে যায়।

শব্দার্থ ও টীকা

চিক্কুর	—	চিৎকার। উচ্চ স্বরে কান্না।
পাঞ্জাবি মিলিটারি	—	পাকিস্তানের পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সৈনিক। পাকিস্তানি অন্যান্য সৈন্যদের সঙ্গে এরাও পূর্ব বাংলার নিরস্ত্র জনগণের ওপর নির্মম হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল।
পঁচিশে মার্চ	—	১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ। এই তারিখের কালরাতে পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালিদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ শুরু করে।
গারো পাহাড়	—	বাংলাদেশের ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত পার্বত্য এলাকা।
প্রৌঢ়	—	প্রবীণ। যৌবন ও বার্ধক্যের মাঝামাঝি বয়সের।
খাবি খাওয়া	—	বিপদে পড়ে নিতান্ত নিরুপায় বোধ করা। মরণাপন্ন হওয়া। অসহায় বোধ করা।
চাঙারি	—	বাঁশের তৈরি ডালা, ঝুড়ি বা টুকরি।
নিমেষে	—	চোখের পলকে।
কাফেলা	—	সারি বেঁধে চলা পথিকের দল।
জালা	—	মাটির তৈরি পেট মোটা বড় পাত্র।
নাজেহাল	—	হয়রান। পেরেশান। জব্দ।
জয়িফ	—	দুর্বল। হীনবল। বৃদ্ধ। জরাজীর্ণ।
অসয়োস্তি	—	অস্বস্তি। মনের অশান্তি।
কুঁচো ছেলেমেয়ে	—	ছোট ছোট ছেলেমেয়ে।
উপযাচক	—	যে যেচে বা স্ব-উদ্যোগী হয়ে কিছু করে।
উর্দি	—	সৈনিকদের জন্য নির্ধারিত পোশাক।

পাঠের উদ্দেশ্য

মুক্তিযুদ্ধের সময়কার পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া।

পাঠ-পরিচিতি

মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই যুদ্ধে পাকিস্তানিদের অত্যাচারের দৃশ্য দেখে একজন কিশোর কীভাবে তাদের প্রতিরোধ করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়—শওকত ওসমানের 'তোলপাড়' গল্পে তাই ব্যক্ত হয়েছে। কিশোর সাবু গাঁয়ের সড়কে শহর থেকে পালানো হাজার হাজার মানুষ দেখে অবাক

হয়। অত্যাচারিত ও ক্লান্ত মানুষদের মুড়ি বা পানি পান করিয়ে সে সান্ত্বনা খোঁজে। সাবু দেখতে পায়, নারী, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবাই শহর থেকে পালাচ্ছে। পাকিস্তানিরা নির্বিচারে সবাইকে হত্যা করছে বলে তারা সংবাদ পায়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর এই নিষ্ঠুরতা অনুভব করে সাবু ক্ষুব্ধ হয়। শহরত্যাগী মানুষের অসহায়ত্ব ও দুঃখ-কষ্ট দেখে তার মন বেদনায় ভরে ওঠে। অত্যাচার মোকাবিলা করার জন্য তার কিশোর মন আন্দোলিত হয়ে ওঠে।

লেখক-পরিচিতি

শওকত ওসমানের প্রকৃত নাম আজিজুর রহমান। তাঁর জন্ম পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার সবল সিংহপুর গ্রামে ১৯১৭ সালে। দীর্ঘদিন তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। তবে অধ্যাপনা-জীবনে প্রবেশ করার আগে তাঁর চাকরিজীবন ছিল বিচিত্র। শওকত ওসমান বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক। ছোটদের জন্য তিনি যে সব গ্রন্থ লিখেছেন সেগুলো হচ্ছে : 'ওটন সাহেবের বাংলো', 'ডিগবাজি', 'মসকুইটো ফোন', 'তারা দুইজন', 'ক্ষুদে সোশালিস্ট', 'ছোটদের নানা গল্প', 'কথা রচনার কথা', 'পঞ্চসঙ্গী' ইত্যাদি। তিনি বেশ কয়েকটি সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। পুরস্কারগুলো হচ্ছে : আদমজী সাহিত্য পুরস্কার, বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, একুশে পদক, নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক, ফিলিপ্‌স সাহিত্য পুরস্কার ইত্যাদি। ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

বন্ধুরা চলো আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের সময় কী কী ঘটেছিল তা স্থানীয় কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার কাছ থেকে জেনে নিই। তাঁদের অভিজ্ঞতাগুলো খাতায় লিখে রাখি। তারপর অভিজ্ঞতাগুলো সাজিয়ে একটি গল্প লেখার চেষ্টা করি।

চলো তাহলে গল্পটি লেখার চেষ্টা করি (এ জন্য আলাদা কাগজ ব্যবহার করতে পারি)।

ভোর রাতেই হাফিজ ভাই খবর নিয়ে এলেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী দু-এক দিনের মধ্যে গ্রামে হানা দিতে পারে। খবরটি শুনেই গ্রামে বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া শুরু হলো।...

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. শওকত ওসমানের প্রকৃত নাম কী?

ক. শওকত আলী খ. শেখ আজিজুল হক

গ. আজিজুর রহমান ঘ. হাসান আজিজুল হক

২. সাবুর বড় লজ্জা লাগে কেন?

ক. গায়ে কিছু না থাকায় খ. মহিলা পাঁচ টাকা দিতে চাওয়ায়

গ. পর্যাপ্ত পানি দিতে না পারায় ঘ. ফায়-ফরমাশ খাটতে হওয়ায়

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

গাঁয়ের জমিদার শ্রমিকদের দিয়ে তার পুকুর পরিষ্কার করিয়েছিল। শ্রমিকরা পারিশ্রমিক চাইতে এলে জমিদার তাদের পেটানো শুরু করল। এই দৃশ্য দেখে গাঁয়ের সাহসী মেয়ে তাহমিনা ক্রোধে ফেটে পড়ে।

৩. উদ্দীপকের তাহমিনার সঙ্গে 'তোলপাড়' গল্পের কাকে তুলনা করা যায়?

ক. শওকত ওসমানকে খ. জৈতুন বিবিকে

গ. মিসেস রহমানকে ঘ. সাবুকে

৪. উদ্দীপকের জমিদার ও 'তোলপাড়' গল্পের পাঞ্জাবি মিলিটারিদের অত্যাচারে প্রকাশ পেয়েছে—

i. ক্ষমতার দাপট

ii. জুলুমের দাপট

iii. অন্যায়ের দাপট

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রিকশায় ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়ে আমিন সাহেব পায়ে ভীষণ ব্যথা পেলেন। ফারুক তাঁকে উঠিয়ে পরিচয় জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, আমি মুক্তিযোদ্ধা আমিন। ফারুক তাঁকে সালাম জানিয়ে কাছের বন্ধুদের ডেকে এনে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। মুক্তিযোদ্ধা আমিন সুস্থ হয়ে ফারুককে কিছু বখশিশ দিতে চাইলে ফারুক একজন মুক্তিযোদ্ধার সেবা করতে পারাকেই বড় বখশিশ বলে জানায়।

ক. সাবুর মায়ের নাম কী?

খ. 'আর এখন কিছু করতে না পারলে অসোয়াস্তি'—সাবুর এই মনোভাবের কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে 'তোলপাড়' গল্পের মিসেস রহমানের কোন ঘটনার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর ফারুকের ভূমিকা 'তোলপাড়' গল্পের সাবুর ভূমিকারই প্রতিচ্ছবি? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

২. রসুলপুর এলাকায় হঠাৎ নাম না জানা এক ভাইরাসের আক্রমণে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। কয়েকজনের মৃত্যুর খবর দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দু-চারদিনের মধ্যেই তা মহামারির আকার ধারণ করে। এলাকার মানুষ ভয়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছিল। এসব দেখে নিঃসন্তান বিধবা করিমন্নেসা তার বাড়ির যুবক ছেলেদেরকে অসুস্থ লোকদের সহায়তার পরামর্শ দেন। বাড়ির কিছু ছেলে এ পরামর্শ না শুনে ভয়ে এলাকা ছেড়ে চলে যায়। আর অন্যরা বাড়িতে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান নেয়। এসব দেখে করিমন্নেসা মর্মাহত হয়ে নিজেই অসুস্থ রোগীদের সেবা শুরু করলেন এবং অনেককে সুস্থ করে তুললেন।

ক. সাবু চিৎকার করে কাকে ডাকছিল?

খ. 'আমার মাকে আপনি চেনেন না'—এ কথা দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

গ. করিমন্নেসার চরিত্রে জৈতুন বিবির যে বৈশিষ্ট্যটি পরিলক্ষিত হয় তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "করিমন্নেসার বাড়ির ছেলেদের কর্মকাণ্ডই কি তোলপাড় গল্পের প্রতিচ্ছবি?"—তোমার মতামত উপস্থাপন কর।

আকাশ

আবদুল্লাহ আল-মুতী
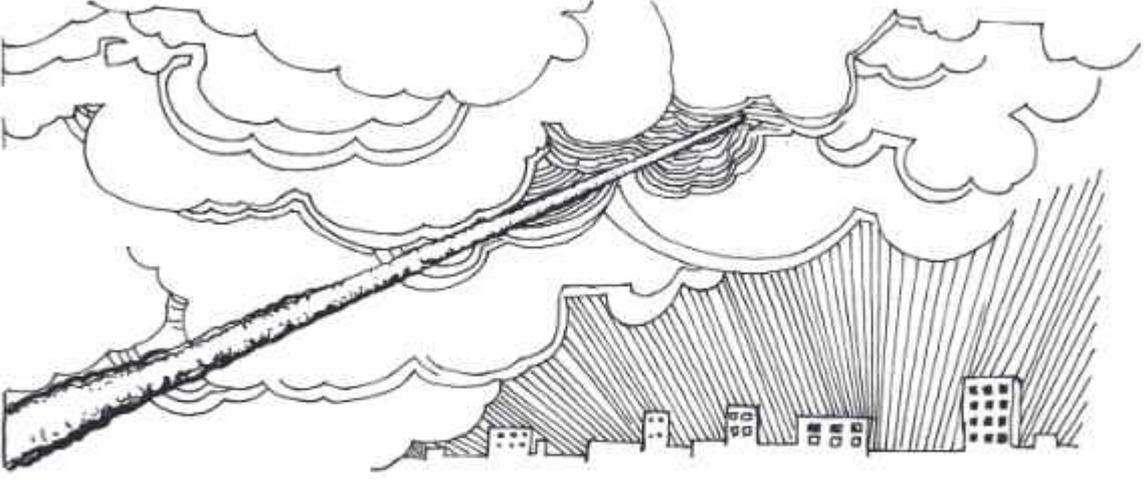
খোলা জায়গায় মাথার ওপরে দিনরাত আমরা আকাশ দেখতে পাই। গাছপালা, নদীনালা দুনিয়ায় কোথাও আছে, কোথাও নেই। এমনকি ঘরবাড়ি, জীবজন্তু, মানুষও সব জায়গায় না থাকতে পারে। কিন্তু আকাশ নেই, ভূপৃষ্ঠে এমন জায়গা কল্পনা করা শক্ত।

দিনের বেলা সোনার থালার মতো সূর্য তার কিরণ ছড়ায় চারপাশে। এমনি সময়ে সচরাচর আকাশ নীল। কখনো সাদা বা কালো মেঘে ঢেকে যায় আকাশ। ভোরে বা সন্ধ্যায় আকাশের কোনো কোনো অংশে নামে রঙের বন্যা। কখনো-বা সারা আকাশ ভেসে যায় লাল আলোতে। রাতের আকাশ সচরাচর কালো, কিন্তু সেই কালো চাঁদোয়ার গায়ে জ্বলতে থাকে রুপালি চাঁদ আর অসংখ্য ঝকঝকে তারা আর গ্রহ।

আগেকার দিনে লোকে ভাবতো, আকাশটা বুঝি পৃথিবীর ওপর একটা কিছু কঠিন ঢাকনা। কখনো তারা ভাবতো, আকাশটা পরতে পরতে ভাগ করা।

আজ আমরা জানি, আকাশের নীল চাঁদোয়াটা সত্যি সত্যি কঠিন কোনো জিনিসের তৈরি নয়। আসলে এ নিতান্তই গ্যাস-ভরতি ফাঁকা জায়গা। হরহামেশা আমরা যে আকাশ দেখি তা আসলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঢাকনা। সেই বায়ুমণ্ডলে রয়েছে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড এমনি গোটা কুড়ি বর্ণহীন গ্যাসের মিশেল। আর আছে পানির বাষ্প আর ধুলোর কণা।

আকাশ যদি বর্ণহীন গ্যাসের মিশেল, তবে তা নীল দেখায় কেন? মাঝে মাঝে সাদা আর লাল রঙের খেলাই-বা দেখি কী করে? আসলে সাদা মেঘে রয়েছে জলীয়বাষ্প জমে তৈরি অতি ছোট ছোট অসংখ্য পানির কণা। কখনো মেঘে এসব কণার গায়ে বাষ্প জমার ফলে ভারি হয়ে বড় পানির কণা তৈরি হয়। তখন সূর্যের আলো তার ভেতর দিয়ে আসতে পারে না, আর তাই সে মেঘের রং হয় কালো।

কিন্তু সারাটা আকাশ সচরাচর নীল রঙের হয় কী করে? আকাশ নীল দেখায় বায়ুমণ্ডলে নানা গ্যাসের অণু ছড়িয়ে আছে বলে। এইসব গ্যাসের কণা খুব ছোট মাপের আলোর ঢেউ সহজে ঠিকরে ছিটিয়ে দিতে

পারে। এই ছোট মাপের আলোর ঢেউগুলোই আমরা দেখি নীল রঙ হিসেবে। অর্থাৎ পৃথিবীর ওপর হাওয়ার স্তর আছে বলেই পৃথিবীতে আকাশকে নীল দেখায়।

সকাল-দুপুর-সন্ধ্যায় আকাশের রঙ হুবহু এক রকম থাকে না। এরও কারণ হলো পৃথিবীর ওপরকার বায়ুমণ্ডল। সূর্য থেকে যে আলো আমাদের চোখে পড়ে, তাকে পৃথিবীর ওপরকার বিশাল হাওয়ার স্তর পেরিয়ে আসতে হয়। দুপুর বেলা এই আলো আসে সরাসরি অর্থাৎ প্রায় লম্বভাবে হাওয়ার স্তর ফুঁড়ে। কিন্তু সকালে বা সন্ধ্যায় এই আলো আসে তেরছাভাবে হাওয়ার স্তর পেরিয়ে। তাতে আলোকে হাওয়ার কণা ডিঙাতে হয় দুপুরের তুলনায় অনেক বেশি।

সকালে বা সন্ধ্যায় মেঘ আর হাওয়ার ধুলোর কণার ভেতর দিয়ে লম্বা পথ পেরিয়ে আসতে পারে শুধু সূর্যের লাল আলোর ঢেউগুলো। সে মেঘকে তখন দেখায় লাল। ঘন বৃষ্টি-মেঘের বড় বড় কণারা যখন আকাশ ছেয়ে ফেলে, তখন তার ভেতর দিয়ে আলো পেরিয়ে আসতে পারে না, তাই সে মেঘকে দেখায় কালো।

আগেকার দিনে আমাদের ওপরকার আকাশ নিয়ে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন শূন্যে বেলুন পাঠিয়ে বা যন্ত্রপাতিসুদ্ধ রকেট পাঠিয়ে। আজ মানুষ নিজেই মহাকাশযানে চেপে সফর করছে পৃথিবীর উপরে বহু দূর পর্যন্ত। পৃথিবী ছাড়িয়ে যেতে পেরেছে চাঁদে। পৃথিবীর উপর দেড়শ দুশ মাইল বা তারো অনেক বেশি উপর দিয়ে ঘুরছে অসংখ্য মহাকাশযান। যেখান দিয়ে ঘুরছে সেখানে হাওয়া নেই বললেই চলে।

মহাকাশযান থেকে দিনরাত তোলা হচ্ছে পৃথিবীর ছবি। জানা যাচ্ছে কোথায় কখন আবহাওয়া কেমন হবে, কোন দেশে কেমন ফসল হচ্ছে। মহাকাশযান থেকে ঠিকরে দেওয়া হচ্ছে টেলিফোন আর টেলিভিশনের সংকেত। তাই দূরদেশের সজো যোগাযোগ আজ অনেক সহজ হয়ে উঠেছে।

শব্দার্থ ও টীকা

ভূপৃষ্ঠ	—	পৃথিবীর উপরের অংশ।
সচরাচর	—	সাধারণত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। প্রায়শ।
চাঁদোয়া	—	শামিয়ানা। কাপড়ের ছাউনি।
পরতে পরতে	—	স্তরে স্তরে। ভাঁজে ভাঁজে।
কণা	—	বস্তুর অতি সূক্ষ্ম বা ক্ষুদ্র অংশ।
হরহামেশা	—	সবসময়। সর্বদা।
বায়ুমণ্ডল	—	পৃথিবীর উপরে যতদূর পর্যন্ত বাতাস রয়েছে।
নাইট্রোজেন	—	বর্ণ ও গন্ধ নেই এমন একটি মৌলিক গ্যাস, বাতাসের প্রধান উপাদান।
অক্সিজেন	—	জীবের প্রাণ বাঁচানো ও আগুন জ্বালানোর জন্য দরকারি বর্ণহীন, স্বাদহীন, গন্ধহীন মৌলিক গ্যাস।
কার্বন ডাই অক্সাইড	—	কার্বন পুড়ে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয়। প্রাণীর নিশ্বাসের সজো বের হওয়া বর্ণগন্ধহীন গ্যাস।
মিশেল	—	বিভিন্ন বস্তুর মিলন। মিশ্রণ।
জলীয়বাষ্প	—	পানির বায়বীয় অবস্থা।
ঠিকরে	—	ছিটকে। ছড়িয়ে।

হুবহু	— অবিকল। একেবারে একই রকম।
স্তর	— একের ওপর আর এক—এমনিভাবে সাজানো। ধাপ।
লম্বভাবে	— খাড়াভাবে।
ফুঁড়ে	— ভেদ করে।
তেরছা	— বাঁকা। আড়। হেলানো।
রকেট	— গ্রহে-উপগ্রহে যেতে পারে এমন মহাকাশযান।
মহাকাশযান	— মহাকাশে যাতায়াতের বাহন।
সংকেত	— ইঙ্গিত। ইশারা।

পাঠের উদ্দেশ্য

বিজ্ঞানচেতনা জাগ্রত করা।

পাঠ-পরিচিতি

এক সময় আকাশকে মনে করা হতো মানুষের মাথার উপরে বিশাল একটি ঢাকনা বলে। আসলে আকাশ কোনো ঢাকনা নয়। এ হচ্ছে বায়ুর স্তর। বাতাসে প্রায় বিশটি বর্ণহীন গ্যাস মিশে আছে। বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাসের অণু ছড়িয়ে আছে বলে আকাশ নীল দেখায়। সকাল বা সন্ধ্যায় মেঘ ও বাতাসের ধুলোকণার মধ্যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে পারে শুধু সূর্যের লাল আলো। তাই এ সময় মেঘ লাল দেখায়। ঘন বৃষ্টি ও মেঘে ছেয়ে ফেললে আকাশ দেখায় কালো। শূন্যে মহাকাশযান পাঠিয়ে বিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। পৃথিবীর অন্তত কয়েক শ' মাইল ওপর দিয়ে পাঠানো মহাকাশযান থেকে প্রেরিত অসংখ্য ফটো বা ভিডিও থেকে মানুষ আবহাওয়ার খবর পাচ্ছে। একই কারণে টেলিভিশন, টেলিফোন, মোবাইল ফোন ইত্যাদিতে সংকেত পাঠিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত করা সম্ভব হয়েছে।

লেখক-পরিচিতি

শিশুদের জন্য বিজ্ঞানবিষয়ক সাহিত্য রচনা করে আবদুল্লাহ আল-মুতী বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি সিরাজগঞ্জ জেলার ফুলবাড়িতে ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বিজ্ঞানের অনেক জটিল রহস্যময় অজানা দিককে তিনি আকর্ষণীয় ও সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন।

ছোটদের জন্যে তাঁর লেখা বইগুলো হচ্ছে: 'এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে', 'অবাক পৃথিবী', 'আবিষ্কারের নেশায়', 'রহস্যের শেষ নেই', 'জানা অজানার দেশে', 'সাগরের রহস্যপুরী', 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে', 'ফুলের জন্য ভালোবাসা' ইত্যাদি।

সাহিত্য রচনা ও বিজ্ঞান সাধনার জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ইউনেসকো আন্তর্জাতিক কলিঙ্গ পুরস্কারসহ অনেক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তিনি ১৯৯৮ সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

১. এসো শিক্ষার্থীরা, আমরা স্কুলে আসা দৈনিক পত্রিকার সাপ্তাহিক বিজ্ঞান পাতাগুলো সংগ্রহ করি। তারপর পাতাগুলোর কয়েকটি বিষয় আমরা দলে ভাগ হয়ে পাঠ করি। পঠিত বিষয়ে আমাদের জ্ঞান ও ধারণা শ্রেণিকক্ষে দলীয়ভাবে পোস্টার পেপারের মাধ্যমে উপস্থাপন করি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. রাতের আকাশ সচরাচর কী রঙের হয়?

ক. নীল খ. সাদা

গ. কালো ঘ. লাল

২. মহাকাশযান থেকে এখন জানা সম্ভব হচ্ছে—

i. আবহাওয়ার অবস্থা

ii. জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি

iii. বিভিন্ন দেশের ফসল উৎপাদনের অবস্থা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ফাহিম মনে করে আকাশের রঙের ভিন্নতা খেয়াল খুশিমতো হয়ে থাকে। কিন্তু পলির ধারণা এ রঙের ভিন্নতার পেছনে কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি রয়েছে।

৩. 'আকাশ' প্রবন্ধের কোন বাক্যটি পলির ধারণাকে সমর্থন করে?

ক. সকাল-দুপুর-সন্ধ্যায় আকাশের রং হুবহু এক রকম থাকে না।

খ. আকাশটা পরতে পরতে ভাগ করা।

গ. খোলা জায়গায় মাথার ওপরে দিনরাত আমরা আকাশ দেখতে পাই।

ঘ. বায়ুমণ্ডলে নানা গ্যাসের অণু ছড়িয়ে আছে বলে আকাশ নীল দেখায়।

৪. 'আকাশ' প্রবন্ধ অনুযায়ী ফাহিমের ভাবনাটি—

i. অবাস্তব

ii. প্রাচীন

iii. অযৌক্তিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রফিক সাহেব একজন চিকিৎসক। চিকিৎসা করার পাশাপাশি তিনি রোগীর স্বজনদের রোগ-শোকের খবরও নিতেন। হাত দিয়ে রোগীর মাথা, কপাল ও পেট টিপে রোগ নির্ণয় করে তিনি ওষুধ দিতেন। আধুনিক পদ্ধতিতে রোগনির্ণয় করতে বললেও তিনি তাঁর পদ্ধতিকেই উপযুক্ত মনে করতেন। রফিক সাহেবের ছেলে সুমন এখন বিখ্যাত চিকিৎসক। সুমন সাহেবের রোগ নির্ণয়ের প্রক্রিয়াই ভিন্ন। আলট্রাসনোগ্রাফি, ইসিজি, এক্স-রে ইত্যাদির মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করে তিনি চিকিৎসা করেন। আধুনিক ধ্যান-ধারণা এবং গবেষণাই বিজ্ঞানের জগতে ব্যাপক গতি এনে দিয়েছে।

ক. 'চাঁদোয়া' অর্থ কী?

খ. প্রবন্ধটির নাম 'আকাশ' রাখার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের রফিক সাহেবের মধ্যে 'আকাশ' শীর্ষক প্রবন্ধের কোন দিকটি উঠে এসেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'আধুনিক ধ্যান-ধারণা এবং গবেষণাই বিজ্ঞানের জগতে ব্যাপক গতি এনে দিয়েছে'—উদ্দীপক এবং 'আকাশ' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

মাদার তেরেসা
সন্‌জীদা খাতুন

মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সবসময় তেমন দেখা যায় না। আবার বিভিন্ন যুগে এমন মানুষও পৃথিবীতে আসেন যাঁরা মানুষের সেবাতেই প্রাণমন সব ঢেলে দেন। ভালোবাসা দিয়ে তাঁরা জয় করে নেন দুনিয়া। মাদার তেরেসা ছিলেন তেমনি একজন অসাধারণ মানবদরদি।

মাদার তেরেসা জন্মেছিলেন অনেক দূরের দেশ আলবেনিয়ার স্কপিয়েতে। ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দের ছাব্বিশে আগস্ট তাঁর জন্ম। পিতা ছিলেন বাড়িঘর তৈরির কারবারি, নাম নিকোলাস বোজাঝিউ। মায়ের নাম দ্রানাফিল বার্নাই। পারিবারিক পদবি অনুসারে কন্যার নাম রাখা হয় অ্যাগনেস গোনজা বোজাঝিউ। তিন ভাইবোনের মধ্যে অ্যাগনেস ছিলেন ছোট। বড় হয়ে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের সময় তাঁর নাম হলো মাদার তেরেসা।

তেরেসা যখন খুব ছোট, তখন ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা জুড়ে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছিল। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত চলেছিল এই যুদ্ধ। ইতিহাসে এই যুদ্ধকে বলা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। এতে তেরেসার কোমল মনে খুব আঘাত লেগেছিল। এসময়ে বাবার মৃত্যু পরিবারেও বিপর্যয় ঘটিয়েছিল। দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে বড় হচ্ছিলেন তেরেসা। অল্পবয়সে তাঁর ভেতরে ইচ্ছা জাগে মানুষের

সেবা করবেন, তাদের কষ্ট লাঘব করবেন। তেরেসার বয়স যখন আঠারো, তখন তিনি 'লরেটো সিস্টার্স' নামে খ্রিষ্টান মিশনারি দলে যোগ দেন। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে এরা কাজ করতেন। দার্জিলিং-এ 'লরেটো সিস্টার্স'দের আশ্রমে তিন বছর তিনি নান হওয়ার প্রশিক্ষণ নেন। বাঙালিদের মধ্যে কাজ করার জন্য বাংলা ভাষাও রপ্ত করেন। এরপর কলকাতায় সেন্ট মেরি'জ স্কুলে শিক্ষকতার দায়িত্ব পান। ১৭ বছর সেখানে কাজ করেন তিনি। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সেবার আগ্রহ জাগাতে চেষ্টা করতেন তেরেসা। সপ্তাহে একদিনের টিফিনের পয়সা বস্তির দরিদ্র শিশুদের জন্য খরচ করতে তিনি উৎসাহ দিতেন তাদের।

বাংলার মানুষের দুঃখ-দুর্দশা মাদার তেরেসাকে খুব বিচলিত করছিল। মানুষের সেবায় আরও কাজ করার জন্য মনে খুব তাগিদ অনুভব করছিলেন। অবশেষে ১৯৪৮ সালে লরেটো থেকে বিদায় নিয়ে তিনি শুরু করলেন একেবারে গরিবদের সেবার কাজ। গাউন ছেড়ে পরলেন শাড়ি—বাঙালি নারীর পোশাক। সেই থেকে তিনটির বেশি শাড়ি তার কখনো ছিল না। একটি পরার, একটি ধোয়ার, আরেকটি হঠাৎ দরকার কিংবা কোনো উপলক্ষের জন্য রেখে দেওয়া। তাঁর হাতে টাকা-পয়সাও বিশেষ ছিল না। তবে মনে ছিল গরিব-দুখি মানুষের জন্য ভালোবাসা আর প্রবল এক আত্মবিশ্বাস।

কলকাতার এক অতি নোংরা বস্তিতে তিনি প্রথম স্কুল খুললেন। বেঞ্চ-টেবিল কিছু নেই, মাটিতে দাগ কেটে শিশুদের শেখাতে লাগলেন বর্ণমালা। অসুস্থদের সেবার জন্য খুললেন চিকিৎসাকেন্দ্র। ধীরে ধীরে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন অনেক মানুষ। মাদার তেরেসার কাজের পরিধি ক্রমাগত বেড়ে চলল। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন আরও অনেক নান। তাদের নিয়ে তিনি গড়লেন মানবসেবার সংঘ—'মিশনারিজ অব চ্যারিটি'।

সবচেয়ে যারা গরিব, সবচেয়ে করুণ যাদের জীবন, তাদের সেবা করার ব্রত ছিল মাদার তেরেসার। মৃত্যুমুখী অসহায় মানুষের সেবার জন্য তিনি ১৯৫২ সালে কলকাতার কালিঘাটে 'নির্মল হৃদয়' নামে এক ভবন প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতায় ফুটপাতে সহায়-সম্বলহীন বহু মানুষের বাস। অসুখে ধুঁকে ধুঁকে তাঁদের অনেকের প্রায় মৃত্যুদশা। মরণাপন্ন এইসব মানুষকে বুকে তুলে নেন মাদার তেরেসা। নির্মল হৃদয়ে এনে মমতাময়ী মা কিংবা বোনের মতো তাদের সেবাযত্ন করেন।

রাস্তা থেকে তুলে আনা অনাথ শিশুদের আশ্রয় দিতে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'শিশুভবন'। শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য স্থাপন করেন 'নবজীবন আবাস'।

মাদার তেরেসার আরেকটি বড় কাজ কুষ্ঠরোগীদের আবাসন—'প্রেমনিবাস' প্রতিষ্ঠা। ভারতের টিটাগড়ে তিনি প্রথম এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এর আরো অনেক শাখা গড়ে তোলা হয়। কুষ্ঠরোগীদের শরীরে দুর্গন্ধময় দগদগে ঘা হয় বলে সমাজের অনেকে রোগীকে পরিত্যাগ করে। অসুখটা ছোঁয়াচে ভেবে রোগীর কাছ থেকে সবাই দূরে থাকে। ফলে কুষ্ঠরোগীদের জীবন হয়ে ওঠে খুব কষ্টের। মাদার তেরেসা নিজের হাতে কুষ্ঠরোগীদের সেবা করতেন। তাঁদের ঘা ধুইয়ে স্নান করিয়ে দিতেন। তাঁর সেবাকর্ম অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করত।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে প্রায় এক কোটি লোক ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরদের অত্যাচারে তারা দেশ ত্যাগ করেছিল। শরণার্থী শিবিরে এত বিপুল সংখ্যক মানুষ রাখা খুব সহজ কাজ ছিল না। সেই সময়ে শিবিরের দুর্গত মানুষের সেবার কাজ করেন মাদার তেরেসা। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে তিনি প্রথম ঢাকায় আসেন। বাংলাদেশে শুরু করেন তাঁর 'মিশনারিজ অব চ্যারিটি'-র সেবাকাজ। ঢাকার ইসলামপুরে প্রথম শাখা গড়ে তোলা হয়। এরপর খুলনা, সাতক্ষীরা, বরিশাল, সিলেট আর কুলাউড়াতে 'নির্মল হৃদয়' ও 'শিশুভবন' প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯১ সালের প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের পর একাশি বছর বয়সী মাদার তেরেসা বাংলাদেশে ছুটে আসেন। তিনি চেয়েছিলেন নিজহাতে দুর্গত মানুষের

ত্রাণের কাজ করবেন। ভালোবাসা দিয়ে মানুষের জীবনকে শান্তিময় করার জন্য কাজ করে গেছেন মাদার তেরেসা। সেবাকাজে মানুষকেই সবচেয়ে বড় করে দেখেছিলেন তিনি। ধর্মের ফারাক, দেশের ভিন্নতা, জাতির পার্থক্য তিনি কখনো বিবেচনায় নেন নি। তাই সব দেশের সব ধর্মের মানুষের ভালোবাসা তিনি পেয়েছেন। সেবাকাজের জন্য বহু সম্মাননা তিনি লাভ করেছেন, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো নোবেল পুরস্কার। সে পুরস্কার শান্তির কাজের জন্য। জীবনে কোনো পুরস্কারের অর্থই নিজের জন্য ব্যয় করেন নি মাদার তেরেসা, নোবেল পুরস্কারের অর্থও দান করেছেন দুঃখীজনের জন্য। সেই সাথে আরেকটি কাজ করেছিলেন। নোবেল পুরস্কার প্রদান উপলক্ষে সুইডেনের নোবেল কমিটি এক ভোজসভার আয়োজন করে। মাদার তেরেসা অনুরোধ করেছিলেন ভোজসভা বাতিল করে সেই অর্থ ক্ষুধার্ত মানুষদের দেওয়ার জন্যে। এই সংবাদ জানতে পেরে সুইডেন ও অন্যান্য দেশের মানুষ এগিয়ে আসেন। এঁদের মধ্যে স্কুলের অনেক ছাত্রছাত্রীও ছিল। তারা মাদার তেরেসাকে যে সাহায্য করেছিলেন সেটা ছিল নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্যের অর্ধেক।

১৯৯৭ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় এই সেবাব্রতীর মৃত্যু হয়।

সারা জীবন মাদার তেরেসা মানুষের সেবা করেছেন, সেই সাথে মানুষের সেবায় এগিয়ে আসতে অন্যদের অনুপ্রাণিত করেছেন। নীলপাড় সাদা শাড়িপরা ছোটখাটো এই মানুষটিকে তাই দুনিয়ার সবাই এক ডাকে চেনে। মানুষের মনে তিনি বেঁচে থাকবেন চিরকাল।

শব্দার্থ ও টীকা

মানবদরদি	—	মানুষের জন্য যার দরদ বা সমবেদনা আছে।
সন্ন্যাসব্রত	—	সংসারজীবন ত্যাগ করে তপস্যা ও সংযমের সাধনা।
মিশনারি	—	ধর্মপ্রচারক।
নান	—	গির্জা বাসিনী। সন্ন্যাসিনী। Nun.
অনাথ	—	মা-বাবা এবং অভিভাবক নেই যে-সব শিশুর। এতিম।
প্রশিক্ষণ	—	হাতে-কলমে বিশেষ শিক্ষা।
রপ্ত	—	আয়ত্ত। অভ্যাসের সাহায্যে শিখে নেয়া।
গাউন	—	মহিলাদের বিশেষ ধরনের পোশাক।
মিশনারিজ অব চ্যারিটি	—	পরের উপকারের উদ্দেশ্যে স্থাপিত প্রতিষ্ঠান, মানবসেবা সংঘ।
সেবাব্রতী	—	মানুষের সেবা করাই যার ব্রত।
ব্রত	—	সৎকাজ করার জন্যে কঠিন সাধনা ও ত্যাগ।
আবাসন	—	বসবাসের ব্যবস্থা।
পাকিস্তানিদের দোসর	—	১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগী; রাজাকার, আলবদর ইত্যাদি বাহিনীর সদস্যবৃন্দ।
সম্মাননা	—	সম্মান দেখানো। সম্মানের স্বীকৃতি প্রদান।

পাঠের উদ্দেশ্য

নারী ও নারীর কর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা, গরিব ও দুঃখী মানুষের সেবার প্রতি আগ্রহী করে তোলা।

পাঠ-পরিচিতি

মাদার তেরেসা একজন অসাধারণ মানবসেবী। তাঁর জন্মস্থান সুদূর আলবেনিয়া হলেও তিনি অবিভক্ত ভারতের বাংলা অঞ্চলের মানুষের দুঃখ দুর্দশায় বিচলিত হয়েছিলেন। এ কারণে তিনি গরিব ও অসুস্থ মানুষের জন্য তৈরি করেন স্কুল ও চিকিৎসা কেন্দ্র। সমাজে অবহেলিত ও পরিত্যক্ত কুষ্ঠ রোগীদের তিনি নিজের হাতে সেবা করতেন, স্নান করাতেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় নেওয়া দুর্গত মানুষের সেবা করেন মাদার তেরেসা। পরে স্বাধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায়ও খোলা হয় তাঁর মানবসেবা প্রতিষ্ঠান। দেশ, ধর্ম, জাতির পার্থক্য না করে সেবাকাজে মানুষকেই বড় করে দেখেছিলেন তিনি। এ জন্য সব দেশের এবং সব ধর্মের মানুষের কাছেই তিনি পেয়েছেন শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সম্মান। নোবেল পুরস্কার তাঁর তেমনই একটি অর্জন।

লেখক-পরিচিতি

সন্‌জীদা খাতুন ১৯৩৩ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর সন্‌জীদা খাতুন প্রধানত প্রবন্ধকার এবং গবেষক। রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মী হিসেবে তাঁর খ্যাতি আছে। সন্‌জীদা খাতুন সাহিত্য ও গবেষণাকর্মের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন। সংস্কৃতিক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য অর্জন করেছেন বাংলাদেশ সরকারের একুশে পদক। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'সত্যেন্দ্র-কাব্য পরিচয়', 'রবীন্দ্রসংগীতের ভাবসম্পদ', 'ধ্বনি থেকে কবিতা', 'অতীত দিনের স্মৃতি' উল্লেখযোগ্য।

কর্ম-অনুশীলন

১. মানবসেবায় অবদান রেখেছেন এমন পাঁচজন ব্যক্তির কর্মজগৎ নিয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

২. তোমার পরিচিত যে-সব মানুষ ছোটখাটো দান ও সেবার মধ্যদিয়ে মানুষের কল্যাণ সাধন করতে চেষ্টা করছেন তাদের সম্পর্কে লেখ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মাদার তেরেসা দার্জিলিং-এ কীসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন?

ক. নান হওয়ার
খ. অসুস্থদের সেবা করার
গ. মাতৃভাষায় শিক্ষকতার
ঘ. ধর্ম প্রচার করার

২. মাদার তেরেসা কী উদ্দেশ্যে প্রেম নিবাস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

ক. প্রতিবন্ধী শিশুদের পরিচর্যা
খ. অসহায় মানুষের সেবা
গ. কুষ্ঠ রোগীদের সহায়তা
ঘ. অনাথ শিশুদের আশ্রয়দান

চরণগুলো পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে

আসে নাই কেহ অবনী 'পরে,

সকলের তরে সকলে আমরা,

প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।

৩. কার জীবনে আমরা উক্ত চরণগুলোর আদর্শের বাস্তবায়ন দেখতে পাই?

ক. সন্‌জীদা খাতুনের　　খ. মাদার তেরেসার

গ. দ্রানাফিল বার্নাইর　　ঘ. নিকোলাস বোজাঝিউর

৪. 'মাদার তেরেসা' প্রবন্ধের আলোকে উক্ত চরণগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে—

i. মানবপ্রেম

ii. পরোপকার

iii. পারস্পরিক সহযোগিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রহিমা খাতুন নিজের বাসগৃহে প্রতিবেশী নিরক্ষর মহিলাদের অক্ষরজ্ঞান দিতে শুরু করেন। বেতন ছাড়াই তিনি এ কাজ করেন। ঈদের কেনাকাটা থেকে কিছু টাকা বাঁচিয়ে রহিমা সবচেয়ে গরিব ও লেখাপড়ায় আগ্রহী মহিলাকে পুরস্কার দেন। এতে উৎসাহী হয়ে শিক্ষার্থী বাড়তে থাকে। নিজের ছোট গণ্ডির মধ্যে দায়িত্ববোধ ও মানবসেবার লক্ষ্যে তিনি এই মহৎ কাজ চালিয়ে যান।

ক. সেবা কাজের জন্য মাদার তেরেসার প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ সম্মাননা কোনটি?

খ. মাদার তেরেসা গাউন ছেড়ে শাড়ি পরেছিলেন কেন?

গ. উদ্দীপকের রহিমা খাতুনের টাকা বাঁচানোর কাজটিতে মাদার তেরেসার যে ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে তা বর্ণনা দাও।

ঘ. 'উদ্দীপকের রহিমা খাতুনের চেয়ে মাদার তেরেসার সেবামূলক কাজের পরিধি ছিল ব্যাপক কিন্তু তাদের লক্ষ্য অভিন্ন।'—কথাটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

২. আবদুল মজিদ মাস্টারের অর্থসম্পদ তেমন নেই। কিন্তু অন্যের উপকার করে তিনি খুব আনন্দ পান। এলাকার গরিবদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য মজিদ মাস্টার নিজে কিছু টাকা দিয়ে এবং অন্যদের সহযোগিতায় একটি ফান্ড গঠন করেন। এতে হত-দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিয়ে থেকে শুরু করে পড়াশোনার খরচ ও দাফন-কাফনের কাজও চলতে থাকে।

ক. শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য মাদার তেরেসা কর্তৃক স্থাপিত প্রতিষ্ঠানটির নাম কী?

খ. 'ধর্মের ফারাক, দেশের ভিন্নতা, জাতির পার্থক্য মাদার তেরেসা কখনো বিবেচনায় নেন নি'– কেন?

গ. উদ্দীপকের আবদুল মজিদ মাস্টারের মধ্যে মাদার তেরেসার কাজের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তার ব্যাখ্যা দাও।

ঘ. 'আবদুল মজিদ মাস্টার ও মাদার তেরেসার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে মানবজীবন শান্তিময় হয়ে উঠবে।'—এ বাক্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

খাদ্যশস্যের পরেই বাংলাদেশের মানুষের জীবনের সঙ্গে যে জিনিসটি অতি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে, তা হলো এখানকার কুটিরশিল্প। এক সময়ে ঘর-গৃহস্থালির নিত্য ব্যবহারের প্রায় সব পণ্যই এদেশের গ্রামের কুটিরে তৈরি হতো। আজও অনেক কিছুই হয়। এগুলো কুটিরশিল্পের মাধ্যমে তৈরি হলেও শিল্পগুণ বিচারে এ ধরনের সামগ্রী লোকশিল্পের মধ্যে গণ্য।

আমাদের দেশের বিভিন্ন লোকশিল্পের কতকগুলো এক সময়ে এমন উচ্চমানের ছিল যে, আজও আমরা সেসব জিনিসের কথা স্মরণ করে গর্ববোধ করি।

প্রথমে বলতে হয় ঢাকাই মসলিনের কথা। ঢাকা শহরের অদূরে ডেমরা এলাকার তাঁতিদের এ অমূল্য সৃষ্টি এককালে দুনিয়া জুড়ে তুলেছিল প্রবল আলোড়ন। ঢাকার মসলিন তৎকালীন মোগল বাদশাহদের বিলাসের বস্তু ছিল। মসলিন কাপড় এত সূক্ষ্ম সুতা দিয়ে বোনা হতো যে, ছোট্ট একটি আংটির ভিতর দিয়ে অনায়াসে কয়েকশ গজ মসলিন কাপড় প্রবেশ করিয়ে দেয়া সম্ভব ছিল। শুধু কারিগরি দক্ষতায় নয়, এ ধরনের কাপড় বুনবার জন্য শিল্পী মন থাকাও প্রয়োজন। আজ সেই মসলিন নেই। তবে মসলিন যারা বুনত, তাদের বংশধররা যুগ যুগ ধরে এ শিল্পধারা বহন করে আসছে বলে জামদানি শাড়ি আমরা আজও দেখতে পাই। বর্তমান যুগে জামদানি শাড়ি দেশে-বিদেশে শুধু পরিচিতই নয়, গর্বের বস্তু।

এমনি আর একটি গ্রামীণ লোকশিল্প আজ লুপ্তপ্রায় হলেও কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যায়। এটি হলো নকশিকাঁথা। এক সময় বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে এ নকশিকাঁথা তৈরির রেওয়াজ ছিল। এক একটি সাধারণ আকারের নকশিকাঁথা সেলাই করতেও কমপক্ষে ছয় মাস লাগত। বর্ষাকালে যখন চারদিকে পানি থৈ থৈ করে, ঘর থেকে বাইরে বের

হওয়া যায় না, এমন মৌসুমই ছিল নকশিকাঁথা সেলাইয়ের উপযুক্ত সময়। মেয়েরা সংসারের কাজ সাঙ্গ করে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে পাটি বিছিয়ে পানের বাটাটি পাশে নিয়ে পা মেলে বসতেন এ বিচিত্র নকশা তোলা কাঁথা সেলাই করতে। পড়শিরাও সুযোগ পেলে আসত গল্প করতে। আপন পরিবেশ থেকেই মেয়েরা তাঁদের মনের মতো করে কাঁথা সেলাইয়ের অনুপ্রেরণা পেতেন। এমনি এক একটি কাঁথা সেলাই কত গল্প, কত হাসি, কত কান্নার মধ্যে দিয়ে শেষ হতো তা বলা যায় না। শুধু কতকগুলো সূক্ষ্ম সেলাই আর রং-বেরঙের নকশার জন্যই নকশিকাঁথা বলা হয় না বরং কাঁথার প্রতিটি সুচের ফোঁড়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে এক-একটি পরিবারের কাহিনি, তাদের পরিবেশ, তাদের জীবনগাথা।

আমাদের দেশের লোকশিল্প বিভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁতশিল্প বাংলাদেশের সব এলাকাতেই আছে; তবে ঢাকা, টাংগাইল, শাহজাদপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম এলাকায় তাঁতশিল্পের মৌলিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

জামদানি শাড়ির কথা আমরা আলোচনা করেছি। নারায়ণগঞ্জ জেলার নওয়াপাড়া গ্রামেই জামদানি কারিগরদের বসবাস। শতাব্দীকাল ধরে এ তাঁতশিল্প বিস্তার লাভ করেছে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরবর্তী এ এলাকায়। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ শীতলক্ষ্যা নদীর পানির বাষ্প থেকে যে আর্দ্রতার সৃষ্টি হয় তা জামদানি বোনার জন্য শুধু উপযোগীই নয়, বরং এক অপরিহার্য বস্তু বলা চলে। ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া এবং পরিস্থিতির জন্য শুধু অতীতের তাঁতিদের তাঁতশিল্পই নয়, বর্তমানের বড় বড় কাপড়ের কারখানাও শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে গড়ে উঠেছে।

কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে প্রস্তুত খাদি বা খদ্দরের সমাদর শুধু গ্রামজীবনেই নয়, শহরের আধুনিক সমাজেও যথেষ্ট রয়েছে। খাদি কাপড়ের বিশেষত্ব হচ্ছে, এর সবটাই হাতে প্রস্তুত। তুলা থেকে হাতে সুতা কাটা হয়। গ্রামবাসীরা অবসর সময়ে সুতা কাটে। এদের বলা হয় কাটুনি। গ্রামে বাড়ির আশেপাশে তুলার গাছ লাগানোর রীতি আছে। সেই গাছের তুলা দিয়ে সুতা কাটা ও হস্ত চালিত তাঁতে এসব সুতায় যে কাপড় প্রস্তুত করা হয়, সেই কাপড়ই প্রকৃত খাদি বা খদ্দর। স্বদেশি আন্দোলনের যুগে বিদেশি কাপড় বর্জন করে দেশি কাপড় ব্যবহারের যে আদর্শ প্রবর্তিত হয়েছিল তারই সাফল্যের স্বাক্ষর এই খাদি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি, বান্দরবান, রামগড় এলাকার চাকমা, কুকি ও মুরং মেয়েরা এবং সিলেটের মাছিমপুর অঞ্চলের মণিপুরি মেয়েরা তাদের নিজেদের ও পুরুষদের পরিধেয় বস্ত্র বুনে থাকে। এ কাপড়গুলো সাধারণত মোটা ও টেকসই হয়। নকশা, রং ও বুনন কৌশল সবই তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী হয়।

বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে কাঁসা ও পিতলের বাসনপত্র এককালে বেশ প্রচলিত ছিল। আজও শত শত গ্রাম্য কারিগর তৈরি করে বিচিত্র ধরনের তৈজসপত্র। প্রথমে মাটির ছাঁচ করে তার মধ্যে ঢেলে দেয় গলিত কাঁসা। ধীরে ধীরে এ গলিত ধাতু ঠান্ডা হয়ে আসে। তখন ওপর থেকে মাটির ছাঁচটি ভেঙে ফেললেই ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে বদনা, বাটি, গ্লাস, থালা ইত্যাদি। তারপর এগুলো পালিশ করা হয়। এ ধরনের বাসনে নানারকম ফুল পাতার নকশা বা ফরমাশকারীর নাম খোদাই করা থাকে। এমনকি আজকাল অতি আধুনিক গৃহসজ্জার সামগ্রী হিসেবে তামা-পিতলের ঘড়া, থালা, ফুলদানি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

পোড়ামাটির কাজের ঐতিহ্য এদেশে বহু যুগের। মাটির কলস, হাঁড়ি, পাতিল, সানকি, ফুলদানি, দইয়ের ভাঁড়, রসের ঠিলা, সন্দেশ ও পিঠার ছাঁচ, টেপা পুতুল, হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী ইত্যাদির মূর্তি গড়বার কাজে বাংলাদেশের পালপাড়া ও কুমোরপাড়ার অধিবাসীরা সারা বছরই ব্যস্ত থাকে। আধুনিক রুচির ফুলদানি, ছাইদানি, চায়ের সেট, কৌটা, বাক্স বা ঘর সাজাবার নানা ধরনের শৌখিন সামগ্রী সব কিছুই মাটি দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে। এ ছাড়া পুরাকালের মসজিদ বা মন্দিরের গায়ে যেসব নকশাদার ইট দেখা যায় তা এদেশের লোকশিল্পের এক অতুলনীয় নিদর্শন।

প্রতীকধর্মী মাটির টেপা পুতুলগুলোর মধ্যে শত শত বছর পূর্বের পাল বা কুমোরদের যে কারিগরিবিদ্যা এবং শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়, তা অভাবনীয়।

কাঠের কাজের খুব বেশি শিল্পগুণ আজকাল দেখা না গেলেও অতীতের কিছু কিছু নমুনা যা দেখতে পাওয়া যায় তা থেকে অনুমান করা যায় যে, এ দেশে এক সময় গৃহনির্মাণের কাজে কারুকার্যে ভূষিত কাঠের ব্যবহার ছিল। বিশেষ করে পুরাতন খাট-পালঙ্ক, খুঁটি-দরজা ইত্যাদির নমুনা আজও দেখা যায়। এ ধরনের কাজকে বলা হয় হাসিয়া। বরিশালের কাঠের নৌকার কাজও বেশ নিপুণতার দাবি রাখে।

খুলনার মাদুর এবং সিলেটের শীতলপাটি সকলের কাছে পরিচিত। গ্রীষ্মকালে ব্যবহারে আরামদায়ক বলেই নয়, শীতলপাটির নকশা একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। অতীতে শীতলপাটির বহু দক্ষ কারিগর ছিল। এ শিল্পীদের দিয়ে এককালে ঢাকার নবাব পরিবার হাতির দাঁতের শীতলপাটি তৈরি করিয়েছিলেন। ঢাকার জাদুঘরে তা সংরক্ষিত আছে। এটি আমাদের লোকশিল্পের এক অতুলনীয় নিদর্শন।

আমাদের গ্রামের ঘরে ঘরে যে শিকা, হাতপাখা, ফুলপিঠা তৈরি করা হয়, তা মোটেই অবহেলার জিনিস নয়। এদের বিচিত্র নকশা, রং এবং কারিগরি সৌন্দর্যের যে নিদর্শন চোখে পড়ে তা শুধু আমাদের অতি আপন বস্তুই নয়, সৌন্দর্যের দিক দিয়েও এদের স্থান বহু উচ্চে। সাধারণ সামগ্রী হলেও যাঁরা এগুলো তৈরি করেন তাঁদের সৌন্দর্যপ্রিয়তার প্রকাশ ঘটে এসব জিনিসের মধ্য দিয়ে। শিকা গৃহস্থালির জিনিসপত্র ঝুলিয়ে রাখার

জন্য তৈরি, একথা সকলেই জানে। শুধু শুধু প্রয়োজন মিটলেই মন ভরে না বলে সৌন্দর্যপ্রিয় মানুষ নানা নকশা জুড়ে দিয়ে তাকেও একটি বিশেষ শিল্পবস্তুতে পরিণত করেছে।

আমাদের দেশে বাঁশ অপ্রতুল নয়। বাঁশের নানারকম ব্যবহার ছাড়া আমাদের চলতেই পারে না। ছোটখাটো সামান্য হাতিয়ারের সাহায্যে আমাদের কারিগররা বাঁশ দিয়ে আজকাল আধুনিক রুচির নানা ব্যবহারিক সামগ্রী তৈরি করছে যা শুধু আমাদের নিজেদের দেশেই নয়, বিদেশেও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ছাড়া সোলাশিল্পের উৎকৃষ্ট সৃজনশীল নমুনাও দেখা যায় পুতুল, টোপর ইত্যাদির মধ্যে।

কাপড়ের পুতুল তৈরি করা আমাদের দেশের মেয়েদের একটি সহজাত শিল্পগুণ। অনেকাংশে এসব পুতুল প্রতীকধর্মী। অবশ্য আজকাল বাস্তবধর্মী কাপড়ের পুতুল তৈরিও শুরু হয়েছে। এগুলো যেমন আমাদের দেশের ঐতিহ্য ও জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে, তেমনি বিদেশি পয়সাও উপার্জন করে।

লোকশিল্প সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের দায়িত্ব আমাদের সকলের। বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর, শহরতলি এবং গ্রামের হাজার হাজার নারী-পুরুষ আছে, যারা কাজ করতে চায় অথচ কাজের অভাবে দিন দিন দারিদ্র্যের শিকার হচ্ছে। সুপরিকল্পিত উপায়ে এবং সুরুচিপূর্ণ লোকশিল্প প্রস্তুতির দিকে মনোযোগ দিলে তাদের সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে।

আমাদের সকলকেই আজ আপন পরিবেশ এবং পরিস্থিতির দিকে শুধু চোখ দিয়ে তাকালে হবে না, হৃদয় দিয়েও তাকাতে হবে। লোকশিল্পের ভিতর দিয়ে হৃদয়-মনের প্রকাশ হলে তা বিদেশিদের হৃদয়ে সাড়া জাগাবে। এভাবে দেশে দেশে হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজেও আমাদের লোকশিল্প সাহায্য করতে পারে।

শব্দার্থ ও টীকা

নিবিড় — ঘনিষ্ঠ।
পণ্য — বিক্রি করা যায় এমন জিনিস।
লোকশিল্প — দেশি জিনিস দিয়ে দেশের মানুষের হাতে তৈরি শিল্পসম্মত দ্রব্য।
অমূল্য — মূল্য দিয়ে যার বিচার করা যায় না।
অপ্রতুল — যথেষ্ট নয়।
দক্ষতা — নিপুণতা, কুশলতা।
লুপ্তপ্রায় — লোপ পেতে বসেছে এমন।
রেওয়াজ — রীতি, পদ্ধতি, ধরন।
অনুপ্রেরণা — উদ্দীপনা, উৎসাহ।
জীবনকথা — জীবনের কাহিনি।
অপরিহার্য — যা এড়ানো যায় না, আবশ্যিক।
মণিপুরি — মণিপুর-সম্পর্কিত, মণিপুরে উৎপন্ন।
ঠিলা — মাটির কলসি, ঘট।

প্রতীকধর্মী — সংকেত বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে বোঝায় এমন।
টোপর — হিন্দু সম্প্রদায়ের বরের মাথার মুকুট।
টেকসই — মজবুত।
ঐতিহ্য — অতীতের গর্ব ও গৌরবের বস্তু।
সংরক্ষণ — বিশেষভাবে রক্ষা করা।
সম্প্রসারণ — প্রসারিত করা, বিস্তার করা।
অনায়াসে — সহজে।
খোদাই করা — খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আঁকা।
ঘড়া — কলসি।
জীবনগাথা — জীবনের গল্প।
দারিদ্র্য — গরিব অবস্থা।
ফরমাশকারী — যিনি আদেশ করেন।
মৌসুম — কাল, ঋতু।
শহরতলি — শহরের কাছাকাছি এলাকা।
সহজাত — স্বাভাবিক।
সানকি — মাটির থালা।
সুপরিকল্পিত — ভালোভাবে পরিকল্পনা করা।
সুরুচিপূর্ণ — রুচিশীল।
সৌন্দর্যপ্রিয়তা — সুন্দরের প্রতি ভালোবাসা।
হস্তচালিত — হাতে চালিত।

পাঠের উদ্দেশ্য

দৈনন্দিন জীবনে ঘর-গৃহস্থালির কাজে নিত্য ব্যবহার্য পণ্যসামগ্রীর অধিকাংশই যে একসময়ে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের কুটিরগুলোতে তৈরি হতো এবং এগুলো যে গুণে ও মানে অনন্য ছিলো সে সম্পর্কে তথ্যমূলক জ্ঞান অর্জন। প্রবন্ধটি পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই শিল্প সম্পর্কে আগ্রহ বাড়বে এবং তারা এগুলো সংরক্ষণেও আন্তরিক হবে।

পাঠ-পরিচিতি

'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধটি 'আমাদের লোককৃষ্টি' গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। লেখক এ প্রবন্ধে বাংলাদেশের লোকশিল্প ও লোক-ঐতিহ্যের বর্ণনা দিয়েছেন। এ বর্ণনায় লোকশিল্পের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধের পরিচয় রয়েছে। আমাদের নিত্যব্যবহার্য অধিকাংশ জিনিসই এ কুটিরশিল্পের ওপর নির্ভরশীল। শিল্পগুণ বিচারে এ ধরনের শিল্পকে লোকশিল্পের মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে।

পূর্বে আমাদের দেশে যে সমস্ত লোকশিল্প তৈরি হতো তার অনেকগুলোই অত্যন্ত উচ্চমানের ছিল। ঢাকাই মসলিন তার অন্যতম। ঢাকাই মসলিন অধুনা বিলুপ্ত হলেও ঢাকাই জামদানি শাড়ি অনেকাংশে সে স্থান অধিকার করেছে। বর্তমানে জামদানি শাড়ি দেশে-বিদেশে পরিচিত এবং আমাদের গর্বের বস্তু।

নকশি কাঁথা আমাদের একটি গ্রামীণ লোকশিল্প। এ শিল্প আজ লুপ্তপ্রায় হলেও এর কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যায়। আপন পরিবেশ থেকেই মেয়েরা তাঁদের মনের মতো করে কাঁথা সেলাইয়ের অনুপ্রেরণা পেতেন। কাঁথার প্রতিটি সুচের ফোঁড়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে এক-একটি পরিবারের কাহিনি, তাদের পরিবেশ, তাদের জীবনগাথা। আমাদের দেশের কুমোরপাড়ার শিল্পীরা মাটি দিয়ে তৈজসপত্র ও বিভিন্ন ধরনের শৌখিন দ্রব্য তৈরি করে থাকে। নানা প্রকার পুতুল, মূর্তি ও আধুনিক রুচির ফুলদানি, ছাইদানি, চায়ের সেট ইত্যাদি তারা গড়ে থাকে। খুলনার মাদুর ও সিলেটের শীতলপাটি সকলের কাছে পরিচিত।

আমাদের দেশের এই যে লোকশিল্প তা সংরক্ষণের দায়িত্ব আমাদের সকলের। লোকশিল্পের মাধ্যমে আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে পারি।

লেখক-পরিচিতি

কামরুল হাসান ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। একজন খ্যাতিমান শিল্পী হিসেবে দেশে-বিদেশে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর আঁকা ছবিতে এদেশের লোকজ জীবনের নানা উপাদান আমাদের ঐতিহ্য-সচেতন করে। লোকশিল্প সংরক্ষণেও তাঁর প্রচেষ্টা ছিল প্রশংসনীয়। কর্মজীবনে তিনি দীর্ঘকাল ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটে অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। পরে তিনি বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ডিজাইন সেন্টারের প্রধান (নকশাবিদ) নিযুক্ত হন। এ সময় তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকশিল্পের নানা উপকরণ সংগ্রহ করেন। ছবি আঁকার বিচিত্র কলাকৌশল এবং লোকশিল্পের নানা দিক সম্পর্কে তাঁর লেখাপত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর একটি বইয়ের নাম 'বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা'। ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে কামরুল হাসান ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. তোমার দেখা একটি লোকশিল্পের পরিচয় তুলে ধরো।

খ. বিভিন্ন লোকশিল্পে যেসব চিহ্ন বা প্রতীক দেখতে পাওয়া যায়, বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে তার একটি তালিকা তৈরি করো (দলগত কাজ)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি মোগল বাদশাহদের বিলাসের বস্তু ছিল ?

ক. নকশি কাঁথা　　খ. ঢাকাই মসলিন

গ. খদ্দরের কাপড়　　ঘ. শীতলপাটি

২. মসলিনের কারিগরদের বংশধরেরা আজও কোথায় বসবাস করছে?

ক. কুমিল্লা　　খ. সিলেট

গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম　　ঘ. নারায়ণগঞ্জ

৩. গ্রামীণ নারীদের আবেগের সাথে সর্বাধিক সম্পৃক্ত লোকশিল্পটি হচ্ছে–

ক. নকশি কাঁথা খ. শীতল পাটি

গ. কাপড়ের পুতুল ঘ. জামদানি শাড়ি

উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

কামাল স্থানীয় কারিগর দ্বারা একটি পিতলের কলস তৈরি করাল। বন্ধুর বিয়েতে কলসটি উপহার দিলে কেউ কেউ উপহাস করল; আবার প্রশংসাও পেল। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বললেন, স্থানীয় কারিগরদের এরূপ লোকশিল্প নিয়ে আমাদের গর্ব করা উচিত।

৪. কামালের দেওয়া উপহারটিকে শিল্পগুণ বিচারে কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা যায়?

ক. আধুনিক শিল্প খ. কুটির শিল্প

গ. চারু শিল্প ঘ. মৃৎ শিল্প

৫. এরূপ উপহার দেওয়ার পিছনে কামালের উদ্দেশ্যকে 'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধের আলোকে বলা যায়–

i. অর্থ সাশ্রয় করা

ii. লোকশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা

iii. ঐতিহ্যকে ধরে রাখা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. দাড়িয়াপুর গ্রামের রহিমা দরিদ্র হলেও শিল্পী মনের অধিকারী। ছোটবেলা থেকেই সে বাঁশ ও বেত দিয়ে সংসারের প্রয়োজনীয় অনেক জিনিস তৈরি করত। কিন্তু আচমকা একদিন তার স্বামী মারা গেলে দুই সন্তান নিয়ে সে পথে বসে। রহিমা উপায়ান্তর না দেখে অবশেষে সুঁই-সুতা হাতে তুলে নেয়। সে তার সুখ-দুঃখের জীবনকে দীঘল সুতার টানে ভাষা দিতে থাকে। একদিন বেসরকারি একটি সংস্থার মাধ্যমে তার সুচিশিল্পগুলো বিদেশে যায় এবং মোটা অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তির পাশাপাশি সে প্রচুর সুনাম অর্জন করে।

ক. কোন এলাকার 'মাদুর' সকলের কাছে পরিচিত?

খ. 'ঢাকাই মসলিনের কদর ছিল দুনিয়া জুড়ে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. স্বামীর মৃত্যুর পর রহিমার কাজটি 'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধে কীসের প্রতিনিধিত্ব করে? বর্ণনা কর।

ঘ. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রহিমার অবদান 'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন কর।

২. সেঁজুতির মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে বার্ষিক লোকশিল্প মেলা চলছিল। সে মেলায় মাটির তৈরি একাধিক পুতুল জমা দেয়। সেগুলো একটি গ্রামীণ পরিবারকে প্রতিনিধিত্ব করে। দর্শনার্থী, বিচারক এবং প্রতিযোগী সবাই মুগ্ধ হয়ে দেখেন এটি। একজন মন্তব্য লেখেন, আমাদের লোকশিল্প যে এত সমৃদ্ধ তা বলে শেষ করার মতো নয়। কিন্তু সময় ও রুচির পরিবর্তনে তা আজ প্রায় ধ্বংসোন্মুখ। আমাদের সকলের এখনই এর প্রতি নজর দেওয়া উচিত। নইলে অচিরেই এ শিল্প ধারাকে আমরা হারাব।

ক. শিল্পগুণ বিচারে আমাদের কুটিরশিল্প কোন শিল্পের মধ্যে পড়ে?

খ. বর্ষাকাল নকশি কাঁথা তৈরির জন্য উপযুক্ত সময় কেন?

গ. সেঁজুতির উদ্যোগ কোন কারিগরের শিল্পের প্রতিনিধিত্ব করে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে লোকশিল্প বাঁচিয়ে রাখার যে তাগিদ অনুভূত হয়েছে তা 'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধের বক্তব্যকে সমর্থন করে কি? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

কত কাল ধরে

আনিসুজ্জামান

বাংলাদেশের ইতিহাস প্রায় আড়াই হাজার বছরের ইতিহাস। হয়তো আরও বেশি সময়ের। এ ইতিহাসের সবটা আজও ভালো করে জানা নেই আমাদের। আলো-আঁধারের খেলায় অনেক পুরানো কথা ঢাকা পড়েছে।

ইতিহাস বলতে শুধু রাজ-রাজড়াদের কথাই বোঝায় না। বোঝায় সব মানুষের কথা। এককালে এদেশে রাজ-রাজড়া ছিল না, তখন মানুষের দাম ছিল বেশি। লোকজন নিজেরাই যুক্তি পরামর্শ করে কাজ করত, চাষ করত, ঘর বাঁধত, দেশ চালাত।

তারপর তেইশ-চব্বিশশ বছর আগে— রাজা এলেন এদেশে। সেই সঙ্গে মন্ত্রী এলেন, সামন্ত-মহাসামন্তের দল এলেন। কত লোক-লস্কর বহাল করা হলো, কত ব্যবস্থা, কত নিয়মকানুন দেখা দিল।

এক কথায় তখন কারো গর্দান যেত, কেউ বড় লোক হয়ে যেত কারও খুশির বদৌলতে। তখন থেকে ইতিহাসে বড় বড় অক্ষরে রাজাদের নাম লেখা হয়ে গেল, আর প্রজারা রইল পেছনে পড়ে।

তবু এদের কথা কিছু কিছু জানা যায়, পরিচয় পাওয়া যায় এদের জীবনযাত্রার।

হাজার বছর আগে সব পুরুষই পরত ধুতি, সব মেয়েই শাড়ি। শুধু সচ্ছল অবস্থা যাদের, তাদের বাড়ির ছেলেরা ধুতির সাথে চাদর পরত, মেয়েরা শাড়ির সাথে ওড়না ব্যবহার করত। এখনকার মতো তখনো মেয়েরা আঁচল টেনে ঘোমটা দিত, শুধু ওড়নাওয়ালিরা ঘোমটা দিত ওড়না টেনে। তবে ধুতি আর শাড়ি দুই-ই হতো বহরে ছোট। তাতে নানা রকম নকশাও কাটা হতো। মখমলের কাপড় পরত শুধু মেয়েরা। নানারকম সূক্ষ্ম পাটের ও সুতোর কাপড়ের চল ছিল। জুতো পরতে পেত না সাধারণ লোকে—শুধু যোদ্ধা বা পাহারাদাররা

জুতো ব্যবহার করত। সাধারণে পরত কাঠের খড়ম। ছাতা-লাঠির ব্যবহার ছিল।

সাজসজ্জার দিকে বেশ ঝোঁক ছিল প্রাচীন বাঙালির। চুলের বাহার ছিল দেখবার মতো। বাবরি রাখত ছেলেরা। না হয় মাথার ওপরে চুড়ো করে বাঁধত চুল। এখন মেয়েরা যেমন ফিতে বাঁধে চুলে, তখন শৌখিন পুরুষেরাও অনেকটা তেমনি করে কোঁকড়া চুল কপালের ওপর বেঁধে রাখত। মেয়েরা নিচু করে 'খোঁপা' বাঁধত—নয়তো উঁচু করে বাঁধত 'ঘোড়াচূড়'। কপালে টিপ দিত, পায়ে আলতা, চোখে কাজল আর খোঁপায় ফুল। নানারকম প্রসাধনীও ব্যবহার করত তারা।

মেয়েরা তো বটেই, ছেলেরাও সে যুগে অলংকার ব্যবহার করত। সোনার অলংকার পরতে পেত শুধু বড়লোকেরা। তাদের বাড়ির ছেলেরাও সুবর্ণকুণ্ডল পরত, মেয়েরা কানে দিত সোনার 'তারঙ্গ'। হাতে, বাহুতে, গলায়, মাথায় সর্বত্রই সোনা-মণি-মুক্তো শোভা পেত তাদের মেয়েদের। সাধারণ পরিবারের মেয়েরা হাতে পরত শাঁখা, কানে কচি কলাপাতার মাকড়ি, গলায় ফুলের মালা।

ভাত বাঙালির বহুকালের প্রিয় খাদ্য। সরু সাদা চালের গরম ভাতের কদর সব চাইতে বেশি ছিল বলে মনে হয়। পুরোনো সাহিত্যে ভালো খাবারের নমুনা হিসেবে যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, তা এই : কলার পাতায় গরম ভাত, গাওয়া ঘি, নালিতা শাক, মৌরলা মাছ আর খানিকটা দুধ। লাউ, বেগুন ইত্যাদি তরিতরকারি প্রচুর খেত সেকালের বাঙালিরা, কিন্তু ডাল তখনো বোধহয় খেতে শুরু করে নি। মাছ তো প্রিয় বস্তুই ছিল—বিশেষ করে ইলিশ মাছ। শুটকির চল সেকালেও ছিল—বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে। ছাগমাংস সবাই খেত—হরিণের মাংস বিয়ে বাড়িতে বা এরকম উৎসবেই সাধারণত দেখা যেত। পাখির মাংসও তাই। ক্ষীর, দই, পায়েস, ছানা—এসব ছিল বাঙালির নিত্যপ্রিয়। আম-কাঁঠাল, তাল-নারকেল ছিল প্রিয় ফল। আর খুব চল ছিল খাজা, মোয়া, নাড়ু, পিঠেপুলি, বাতাসা, কদমা এসবের। মশলা দেওয়া পান খেতেও সকলে ভালোবাসত।

সাধারণ লোকে মাটির পাত্রেই রান্নাবান্না করত। 'জালা', 'হাঁড়ি', 'তেলানি'—সচরাচর এসব পাত্রের ব্যবহারই করা হতো।

সেকালের পুরুষেরা ছিল শিকারপ্রিয়। কুস্তি খেলারও চল ছিল বেশ। মেয়েরা সাঁতার দিতে ও বাগান করতে ভালোবাসত। মেয়েরা খেলত কড়ির খেলা—ছেলেরা দাবা আর পাশা। বড়লোকরা ঘোড়া আর হাতির খেলা দেখত। যাদের সে ক্ষমতা ছিল না, তারা ভেড়ার লড়াই আর মোরগ-মুরগির লড়াই বাঁধিয়ে দিত।

নাচগানের বেশ প্রসার ছিল। বীণা, বাঁশি, কাড়া, ছোটডমরু, ঢাক—এসব বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল।

যাতায়াতের প্রধান উপায় ছিল নৌকা। হাতির পিঠে ও ঘোড়া-গাড়িতে চড়ত শুধু অবস্থাপন্ন লোকেরা। গরুর গাড়ি সাধারণ লোকে ব্যবহার করত—তবে সব সময় নয়—বিশেষ উপলক্ষে। মেয়েরা 'ডুলি'তে চড়ত। পালকির ব্যবহারও ছিল। বড় লোকদের পালকি হতো খুব সাজানো-গোছানো, রাজবাড়িতে হাতির দাঁতের পালকিও থাকত।

বেশির ভাগ লোকই থাকতো কাঠ-খড়-মাটি-বাঁশের বাড়িতে। বড় লোকেরাই শুধু ইট-কাঠের বাড়ি করত।

ওপরের বর্ণনা দিতে গিয়ে বারবার বলতে হয়েছে সকলে এক রকম ছিল না। কেননা, সেই পুরোনো কাল আর নেই, যখন সবাই মিলে মিশে কাজ করত। রাজা এসে গেছেন সমাজে। তাই কেউ প্রভু, কেউ ভৃত্য। কেউ প্রভুর প্রভু, কেউ দাসের দাস! দুজন প্রাচীন সংস্কৃত কবির রচনায় তাই এমন দুটি ছবি পাওয়া যায়—সে দুটো ছবি যে একই দেশের, সে কথা মনে হয় না। একজন দিয়েছেন মেয়েদের বর্ণনা : কপালে কাজলের

টিপ, হাতে চাঁদের কিরণের মতো সাদা পদ্মবৃন্তের বালা ও তাগা, কানে কচি রিঠা ফলের দুল, স্নানস্নিগ্ধ কেশে তিলপল্লব।

আরেকজন এঁকেছেন সংসারের ছবি :

নিরানন্দে তার দেহ শীর্ণ, পরনে ছেঁড়া কাপড়। ক্ষুধায় চোখ আর পেট বসে গেছে শিশুদের, যেন এক মণ চালে তার একশ দিন চলে যায়।

রাজাদের দল এখন আর নেই। মৌর্য-গুপ্ত, পাল-সেন, পাঠান-মুঘল, কোম্পানি-রানি এদের কাল শেষ হয়েছে। আজকের দুই কবিও হয়তো দুই প্রান্তে বসে এমনি করে কবিতা লিখছেন। একজন লিখছেন সমৃদ্ধির কথা, বিলাসের কথা, আনন্দের কথা। আরেকজন ছবি আঁকছেন নিদারুণ অভাবের, জ্বালাময় দারিদ্র্যের, অপরিসীম বেদনার। সরু চালের সাদা গরম ভাতে গাওয়া ঘি—কত কাল ধরে কত মানুষ শুধু তার স্বপ্নই দেখে আসছে।

শব্দার্থ ও টীকা

সামন্ত — রাজা-বাদশার অধীনে ছোট রাজা। অনেক ভূমির মালিক।
লোক-লস্কর — সেনাবাহিনী ও এদের সঙ্গের লোকজন।
গর্দান যেত — মাথা কাটা যেত।
বদৌলতে — প্রভাবে। দয়ায়।
ঘোড়াচূড় — এক ধরনের খোঁপা।
সুবর্ণকুণ্ডল — সোনা দিয়ে তৈরি মোটা চুড়ির মতো গোলাকার অলংকার।
তারঙ্গ — কানে পরার দুল বা অলংকার।
মাকড়ি — এক প্রকার দুল।
ডুলি — পালকির মতো ছোট বাহন।
পদ্মবৃন্ত — পদ্ম ফুলের বোঁটা।
তাগা — বাহুতে পরার অলংকার। মাদুলি। তাবিজ বা তার সুতো।
স্নানস্নিগ্ধ — গোসল সেরে পরিষ্কার ও কোমল হয়েছে এমন।
তিলপল্লব — তিলের নতুন পাতা।
নিরানন্দ — আনন্দহীন। বিষণ্ন। অসুখী।
শীর্ণ — কৃশ। ক্ষীণ। রোগা।

পাঠের উদ্দেশ্য

দেশ ও জাতির ইতিহাস ও জীবনযাত্রার ধারাবাহিক পরিবর্তন সম্পর্কে জানা।

পাঠ-পরিচিতি

বাংলাদেশের ইতিহাস আড়াই হাজার বছর বা তারও বেশি সময়ের পুরোনো। ইতিহাসে থাকে সব রকমের মানুষের জীবনযাত্রার পরিচয়। এককালে বাংলাদেশে রাজার শাসন ছিল না, লোকজন নিজেরাই মিলে-মিশে যুক্তি-পরামর্শ করে দেশ চালাত। তেইশ-চব্বিশ-শ বছর আগে রাজ-রাজড়ার শাসন শুরু হলো প্রাচীনকালে পুরুষেরা পরত ধুতি-চাদর, আর মেয়েরা শাড়ি-ওড়না। সাধারণ লোকের জুতা পরার সামর্থ্য ছিল না, তারা পরত কাঠের খড়ম। পুরোনো দিনেও এ দেশের মানুষের সাজগোজের দিকে নজর ছিল। সোনার অলংকার পরার সুযোগ পেত শুধু ধনীরা। মাছ-ভাত-তরিতরকারি-দুধ-ঘি ইত্যাদি ছিল সেকালের বাঙালির প্রিয় খাদ্য। ইলিশ মাছ ছিল বেশি প্রিয়।

কুস্তি ছিল সেকালের পুরুষদের অত্যন্ত প্রিয় খেলা, নারীদের ছিল সাঁতার। ধনীরা দেখত ঘোড়া ও হাতির খেলা, গরিবরা মজা পেত ভেড়ার লড়াই, মোরগ-মুরগির লড়াই দেখে।

জলপথই ছিল যাতায়াতের প্রধান পথ, তবে স্থলপথও ছিল। বেশির ভাগ লোকই থাকত কাঁচাবাড়িতে। লেখক-কবিদের কেউ কেউ লিখতেন আনন্দ ও সমৃদ্ধির কথা, কারো কারো লেখায় থাকত বেদনা ও দারিদ্র্যের ছবি। সেকালে রাজ-রাজড়া ছিল, এখন নেই। কিন্তু ধনী-দরিদ্র এখনও আছে। সেকালেও সাধারণ মানুষ স্বপ্ন দেখতো সরু চালের সাদা গরম ভাতের। একালেও তারা তাই দেখছে।

লেখক-পরিচিতি

মননশীল প্রাবন্ধিক ও গবেষক আনিসুজ্জামানের জন্ম ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে, কলকাতায়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস অধ্যাপক ছিলেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁর বেশ কিছু গবেষণাগ্রন্থ রয়েছে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো : 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য', 'মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র', 'মুনীর চৌধুরী', 'স্বরূপের সন্ধানে', 'পুরনো বাংলা গদ্য'। এ ছাড়া তিনি বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রধান সম্পাদক।

সাহিত্য-সাধনা ও গবেষণার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি বিভিন্ন পুরস্কার ও পদকে ভূষিত হন। এগুলো হচ্ছে : দাউদ পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, পদ্মভূষণ (ভারত) ইত্যাদি। তিনি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেণ।

কর্ম-অনুশীলন

১. ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি পেশার মানুষের জীবনযাপনের বর্ণনা কর।
২. একক বা দলগতভাবে তোমার স্কুলের ইতিহাস রচনা কর।
৩. দাদা-দাদি, পিতা-মাতা, চাচা-ফুপু ও ভাই-বোনের সহায়তায় তোমার পরিবারের ইতিহাস রচনা কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. প্রাচীনকালে বাঙালির প্রিয় মাছ কী ছিল?

ক. রুই　　খ. কাতলা
গ. পাবদা　　ঘ. ইলিশ

২. সেকালে বেশির ভাগ লোকজনের কাঁচা বাড়িতে বসবাসের কারণ কী ছিল?

ক. অর্থের অভাব　　খ. গৃহ সরঞ্জামের অভাব
গ. রুচিবোধের অভাব　　ঘ. অন্যের অনুকরণ

৩. সেকালে সাধারণ লোক জুতো পরতে পারতো না কেন?

ক. ক্রয়ক্ষমতা ছিল না　　খ. অপছন্দ ছিল
গ. বোঝা মনে হতো　　ঘ. রাষ্ট্রের নিষেধ ছিল

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. শহরের মেয়ে দীপা তার নানাকে নিয়ে নানা বাড়ির গ্রাম দেখতে বের হয়। তার নানা প্রথমে তাকে একটা অবস্থাপন্ন পরিবারে নিয়ে যান। এ পরিবারে তার বয়সী মেয়েরা সালোয়ার-কামিজ পরে, ঠোঁটে লিপিস্টিক দেয়, হাতে চুড়ি ও কানে স্বর্ণের দুল পরে। গৃহিণীরা তাঁতের শাড়ি পরে এবং শাড়ির আঁচল টেনে ঘোমটা দেয়। তাঁদের হাতে ও গলায় স্বর্ণালংকার শোভা পাচ্ছে। এ বাড়ি পেরিয়ে দীপা এক দিনমজুরের খড়ের তৈরি ঝুপড়ি ঘরে ঢুকে পড়ে। দিনমজুরের স্ত্রীর পরনে মলিন শাড়ি, সন্তানদের পরনে ছেঁড়া হাফপ্যান্ট এবং শরীরের রুগ্ণ দশা দেখে দীপার খুব মনঃকষ্ট হয়। সে ভাবে, শত শত বছর চলে যায়, কিন্তু এদেশের দরিদ্র মানুষের জীবনের অভাবগুলো আর চলে যায় না।

ক. বাংলাদেশের ইতিহাস কত বছরের পুরোনো?

খ. ইতিহাস বলতে বোঝায় সব মানুষের কথা– ব্যাখ্যা কর।

গ. দীপার দেখা গ্রামের লোকজনের পোশাক-পরিচ্ছদের সাথে হাজার বছর আগের পূর্বপুরুষদের পোশাকের যে মিল পাওয়া যায় তা বর্ণনা কর।

ঘ. 'শত শত বছর চলে যায়, কিন্তু এদেশের মানুষের জীবনের অভাবগুলো চলে যায় না।'– উদ্দীপক এবং 'কত কাল ধরে' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

কার্টুন, ব্যঙ্গচিত্র ও পোস্টারের ভাষা

আমরা নানাভাবে মতপ্রকাশ করি। কথা বলে, লিখে, ছবি এঁকে, গান গেয়ে – আরো অনেক উপায়ে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি। কার্টুন, ব্যঙ্গচিত্র ও পোস্টার এরকম কয়েকটি মাধ্যম। এগুলো নির্মল হাসির উপাদান হতে পারে, আবার হাসির মাধ্যমে সমাজের নানা অসংগতিও প্রকাশ করা যায়। শুধু তাই নয়, অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেও কার্টুন, ব্যঙ্গচিত্র ও পোস্টার ব্যবহার করা হয়। পৃথিবীর কোনো দেশে যখন বড়ো আন্দোলন হয়, তখন চিত্রশিল্পীরা কার্টুন, ব্যঙ্গচিত্র ও পোস্টার আঁকার মাধ্যমে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এগুলোকে বলা যায় রাজনৈতিক কার্টুন, ব্যঙ্গচিত্র বা পোস্টার। এগুলো আন্দোলনে শক্তি জোগায় এবং মানুষকে আরো উজ্জীবিত করে।

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও অনেক বড়ো বড়ো আন্দোলন-সংগ্রাম হয়েছে, গণঅভ্যুত্থান হয়েছে। নানা শ্রেণি-পেশা আর মতের মানুষ নেমে এসেছে রাস্তায়। তখন আমাদের চিত্রশিল্পীরাও এগিয়ে এসেছেন। তাঁরা মিছিল-মিটিং করেছেন, অন্যদের সাথে নানা কর্মসূচি পালন করেছেন। তবে অন্যদের চেয়ে আলাদা একটা কাজও করেছেন তাঁরা – কার্টুন, ব্যঙ্গচিত্র ও পোস্টার এঁকে আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছেন।

একটা কার্টুনের ছোট্ট ছবিতে প্রতিবাদের বা বিদ্রোহের যে প্রকাশ ঘটে, অনেক সময় হাজার কথায় তা প্রকাশ করা যায় না। অনেক সময় কার্টুন, ব্যঙ্গচিত্র বা পোস্টারের ছবি আন্দোলনের প্রতীক হয়ে ওঠে। বহু মানুষ তাতে মনের ভাষা খুঁজে পায়। আন্দোলন গড়ে ওঠার জন্য সেগুলো শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান থেকে শুরু করে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত বারবার এটা দেখা গেছে। এসব আন্দোলন-সংগ্রামে বহু কার্টুন, ব্যঙ্গচিত্র ও পোস্টার আঁকা হয়েছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সারা দেশের দেয়ালে দেয়ালে অসংখ্য গ্রাফিতি আঁকা হয়েছে।
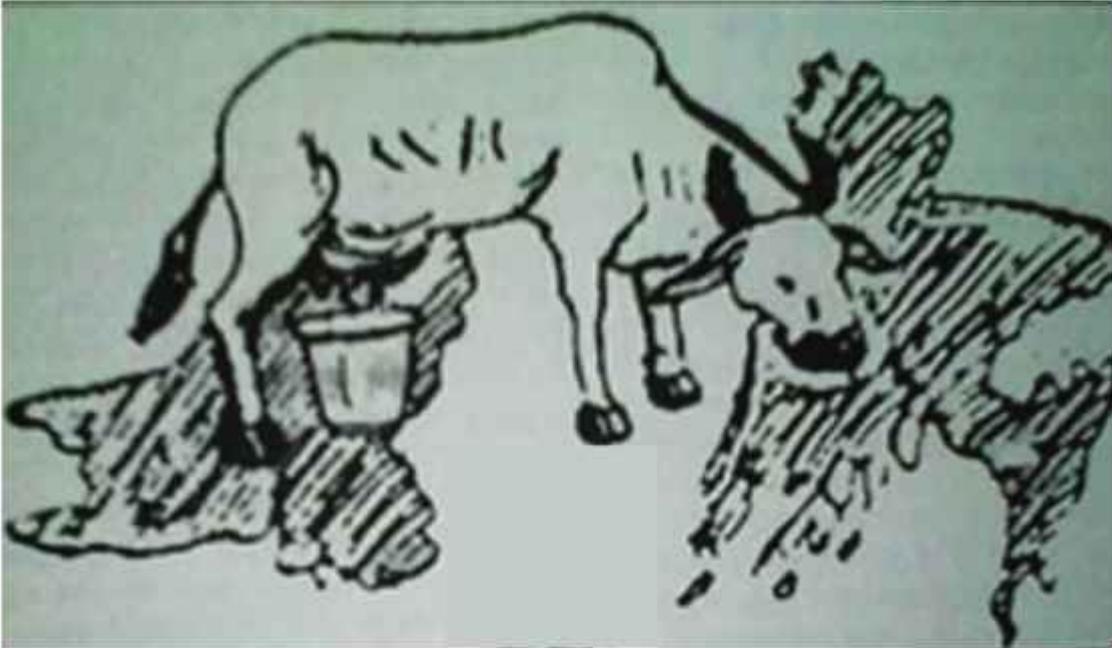
ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় শেখ তোফাজ্জল হোসেনের আঁকা একটি কার্টুনে দেখা যায়, একটি গরু ঘাস খাচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে, কিন্তু তার দুধ চলে যাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে। তখন আমাদের দেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। আমাদের দেশকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকেরা শোষণ করতো। শোষণের কথাটা তিনি এভাবে প্রকাশ করেছেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় নিতুন কুণ্ডুর আঁকা একটি পোস্টার 'সদা জাগ্রত বাংলার মুক্তিবাহিনী' বিভিন্ন স্থানে লাগানো দেখলে সাধারণ মানুষ আশার আলো দেখতে পেত, আর পাকিস্তানি সৈন্যরা ভয় পেত।

দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে

১৯৯০ সালে স্বৈরাচারবিরোধী গণঅভ্যুত্থানের আগে 'দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে' শিরোনামে একটা ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছিলেন পটুয়া কামরুল হাসান। সেটা তখন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। একটি ছবি আর একটিমাত্র বাক্য দেশের মানুষের জন্য অসাধারণ প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিল।

গণবিরোধী শাসকেরা কার্টুন আঁকার জন্য অনেক সময় শিল্পীদের নির্যাতন করে, জেলখানায় বন্দি করে রাখে, এমনকি হত্যাও করে। এইসব ভয়ভীতি উপেক্ষা করেও অনেক চিত্রশিল্পী ছবি ও কার্টুন আঁকেন। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আগে একটি কার্টুনের শিরোনাম লিখেছিলেন বলে লেখক মুশতাক আহমেদকে জেলখানায় নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছিল। গণঅভ্যুত্থানের সময় চিত্রশিল্পী দেবাশিস চক্রবর্তী অনেক কার্টুন ও পোস্টার এঁকেছেন। এগুলো গণঅভ্যুত্থানের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

তবে ২০২৪ সালের অভ্যুত্থানে নাম-না-জানা শিল্পীরাই সবচেয়ে বেশি কার্টুন আর ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন। আন্দোলন চলার সময়ে এঁকেছেন, আন্দোলনের পরেও এঁকেছেন। সবচেয়ে বেশি এঁকেছেন সারাদেশের দেয়ালে। এগুলোকে গ্রাফিতি বলা হয়। এর পাশাপাশি শিল্পীরা বিপুল ব্যঙ্গচিত্র ও মিম প্রচার করেছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। স্বৈরশাসক সবার মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল, কিন্তু কার্টুন-ব্যঙ্গচিত্র আর পোস্টার-মিমের মধ্য দিয়ে তার বিরুদ্ধে কথা বলা সম্ভব হয়েছিল। সারা দেশের দেয়াল জুড়ে আঁকা অসংখ্য গ্রাফিতি হয়ে উঠেছিল প্রতিবাদের ভাষা।

তাই আমাদের মনে রাখতে হবে, অন্যায়ের প্রতিবাদ শুধু লিখে বা কথা বলে নয় – ছবি এঁকে, গান গেয়ে, এমনকি নৃত্য করেও করা যায়। এদেশের মানুষ যুগে যুগে নানা আন্দোলন-সংগ্রামে এমন প্রতিবাদ করেছেন। এইসব কার্টুন, ব্যঙ্গচিত্র ও পোস্টার তাই আমাদের ইতিহাসের সম্পদ। এগুলো আন্দোলনের স্মৃতি ধরে রাখবে, নতুন দিনের নতুন প্রয়োজনে আমাদের নতুনভাবে জাগিয়ে তুলবে।

(সংকলিত)

শব্দার্থ ও টীকা

ব্যঙ্গচিত্র	– বিশেষ ধরনের কার্টুন।
গণঅভ্যুত্থান	– সর্বস্তরের মানুষের যে আন্দোলনের মুখে স্বৈরশাসকরা ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বা দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়।
গ্রাফিতি	– দেয়ালে আঁকা, লেখা বা ছবি, যা শোষকের বিরুদ্ধে জনতার মনের ভাব প্রকাশ করে।
স্বৈরাচার	– স্বেচ্ছাচার, ইচ্ছামত আচরণ।
খপ্পর	– ফাঁদ, কবল।
পটুয়া	– পটচিত্র আঁকে যে, চিত্রকর।

পাঠের উদ্দেশ্য

লেখাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা গণবিরোধী শাসকের বিরুদ্ধে শিল্পীদের প্রতিবাদের ভাষা সম্পর্কে জানতে পারবে। কার্টুন, ব্যঙ্গচিত্র, পোস্টার ও গ্রাফিতির মতো শৈল্পিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও পরিচিত হতে পারবে।

পাঠ-পরিচিতি

শাসকশ্রেণি যখন স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে তখন সকল শ্রেণির মানুষের মতো চিত্রশিল্পীদের মনেও বিদ্রোহ জাগে। জনতার সঙ্গে মিছিল-সমাবেশে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি কার্টুন, ব্যঙ্গচিত্র ও পোস্টার আঁকার মাধ্যমে তাঁরা গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের এ সকল চিত্রকর্ম আন্দোলনে শক্তি যোগায় এবং মানুষকে সামাজিক অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের চেতনায় উজ্জীবিত করে তোলে। বাংলাদেশের নিকট-ইতিহাসে তিনটি গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে – প্রথমটি ১৯৬৯ সালে, দ্বিতীয়টি ১৯৯০ সালে এবং তৃতীয়টি ২০২৪ সালে। প্রতিটি আন্দোলনেই শিল্পীরা শৈল্পিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে তারা বিভিন্নরকম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। চিত্রশিল্পীদের এসব সৃষ্টি ইতিহাসের স্মৃতি যেমন ধরে রাখবে, তেমনি ভবিষ্যতের সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রেরণা হিসেবেও কাজ করবে।

কর্ম-অনুশীলন

ক. কামরুল হাসানকে কেন 'পটুয়া' বলা হয়?
খ. ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের তিনটি গ্রাফিতির বর্ণনা দাও।
গ. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় শেখ তোফাজ্জল হোসেনের আঁকা কার্টুনটির বক্তব্য কী ছিল?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। **উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় শেখ তোফাজ্জল হোসেনের আঁকা কার্টুনে কী ফুটে উঠেছে?**

ক. অত্যাচার   খ. শোষণ
গ. প্রতিবাদ   ঘ. বিদ্রোহ

২। **মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম –**

i. কথা বা লেখা
ii. কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র
iii. ছবি বা পোস্টার

নিচের কোনটি ঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i , ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী রনি। তার মামা নয় বছর পরে বিদেশ থেকে তাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন। তিনি বিমানবন্দর থেকে আসার পথে রাস্তার পাশের বিভিন্ন দেয়ালে নানা ধরনের ছবি, কার্টুন, পোস্টারসহ অনেকরকম লেখা দেখেছেন। এগুলো দেখে তিনি ভাবলেন, দেশে না এলে ২০২৪-এর আন্দোলন সম্পর্কে কখনোই এতটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেত না। রনি তার মামাকে জানায়, এগুলো যারা সৃষ্টি করেছেন তাদের অনেকেই স্বৈরাচারের নির্যাতনের শিকার হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন, কেউ কেউ শহিদও হয়েছেন।

ক. ১৯৭১ সালে নিতুন কুণ্ডুর আঁকা পোস্টারের বিষয় কী ছিল?
খ. একটি বাক্য কীভাবে হাজার মানুষের মুক্তির প্রেরণা হয়ে ওঠে?
গ. উদ্দীপকের দেয়ালের চিত্রকর্মের সঙ্গে 'কার্টুন, ব্যঙ্গচিত্র ও পোস্টারের ভাষা' রচনায় বর্ণিত শিল্পকর্মগুলোর তুলনা করো।
ঘ. "উদ্দীপকটি 'কার্টুন, ব্যঙ্গচিত্র ও পোস্টারের ভাষা' রচনার আংশিক ভাব ধারণ করে।" –বিশ্লেষণ করো।

কবিতা

জন্মভূমি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে ।
সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে॥

জানি নে তোর ধন রতন আছে কি না রানির মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে ॥

কোন্ বনেতে জানি নে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে ॥

আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ওই আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে ॥

শব্দার্থ ও টীকা

সার্থক	— সফল।
জনম	— জন্ম শব্দটির 'ন্ম' যুক্তাক্ষর ভেঙে 'ন'ও 'ম' আলাদা করা হয়েছে। এর আরও দৃষ্টান্ত আছে। যেমন, 'রত্ন' থেকে রতন, 'যত্ন' থেকে যতন।
আকুল	— উৎসুক। ব্যগ্র। অধীর।
মুদব	— বুজব। বন্ধ করব।

পাঠের উদ্দেশ্য

মাতৃভূমির প্রতি গভীর মমত্ববোধ জাগিয়ে তোলা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা।

পাঠ-পরিচিতি

এই গীতবাণীতে জন্মভূমির প্রতি কবির মমত্ববোধ ও গভীর দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে।

জন্মভূমিকে ভালোবাসতে পেরেই কবি তাঁর জীবনের সার্থকতা অনুভব করেন। কবির জন্মভূমি অজস্র ধনরত্নের আকর কি না, তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না। কারণ, তিনি এই মাতৃভূমির স্নেহছায়ায় যে সুখ ও শান্তি লাভ করেছেন তা অতুলনীয়। জন্মভূমির অপরূপ সৌন্দর্যের ঐশ্বর্যে কবি মুগ্ধ। জন্মভূমির বিচিত্র সৌন্দর্যের অফুরন্ত উৎস হচ্ছে বাগানের ফুল, চাঁদের জ্যোৎস্না, সূর্যের আলো। এসব কবির মনকে আকুল করে।

মাতৃভূমির সূর্যালোকে কবির চোখ পরিপূর্ণভাবে জুড়িয়েছে। তাই কবির একান্ত ইচ্ছা জন্মভূমির মাটিতেই যেন তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত হওয়ার সুযোগ পান।

কবি-পরিচিতি

এশীয়দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম নোবেল-বিজয়ী কবি। 'গীতাঞ্জলি' নামের ইংরেজি কবিতার সংকলনের জন্য ১৯১৩ সালে তিনি এই পুরস্কার লাভ করেন। কেবল কবিতা নয়, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, গান— বাংলা সাহিত্যের সকল শাখাই তাঁর একক অবদানে ঐশ্বর্যমণ্ডিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের পঁচিশে বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর হয় নি। সতের বছর বয়সে বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছিলেন। সে পড়াও শেষ না হতেই দেশে ফিরে আসেন তিনি। কিন্তু স্বশিক্ষা ও সাধনায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এনে দেন অতুলনীয় সমৃদ্ধি। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, সুরকার, গীতিকার, নাট্যকার, নাট্য-নির্দেশক, অভিনেতা এবং চিত্রশিল্পী। বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতনের মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তিনি শিক্ষায় নতুন ধারা সৃষ্টি করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে— 'সোনার তরী', 'গীতাঞ্জলি', 'বলাকা' ইত্যাদি কাব্য; 'ঘরে বাইরে', 'গোরা', 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা' ইত্যাদি উপন্যাস; গল্পসংকলন 'গল্পগুচ্ছ'; 'বিসর্জন', 'রাজা', 'ডাকঘর', 'রক্তকরবী' ইত্যাদি নাটক। তিনি ছোটদের জন্য লিখেছেন 'শিশু ভোলানাথ', 'খাপছাড়া' ইত্যাদি। তাঁর রচিত 'আমার সোনার বাংলা' গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের বাইশে শ্রাবণ) কলকাতায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

১. দেশপ্রেমমূলক ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ রচনা করে একটি দেয়াল পত্রিকা তৈরি কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর কাজ)।

২. বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকের দেশপ্রেমমূলক ছড়া, কবিতা, গল্প ও গান নির্বাচন করে একটি দেয়াল পত্রিকা তৈরি কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর কাজ)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবির মন আকুল হয় কীসে?

ক. চাঁদের আলোয় খ. গাছের ছায়ায়
গ. ফুলের গন্ধে ঘ. জন্মভূমির আলোয়

২. 'জন্মভূমি' কবিতার গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে—

i. দেশের মানুষ
ii. জন্মভূমির প্রকৃতি
iii. গভীর দেশপ্রেম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

বনের পরে বন চলেছে বনের নাহি শেষ
ফুলের ফলের সুবাস ভরা এ কোন পরীর দেশ?
নিবিড় ছায়ায় আঁধার করা পাতার পারাবার,
রবির আলো খণ্ড হয়ে নাচছে পায়ে তার।

৩. চরণ দুটির সঙ্গে 'জন্মভূমি' কবিতার মিল রয়েছে—

i. বাংলাদেশের প্রকৃতির
ii. চিরায়ত সৌন্দর্যের
iii. প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

৪. জন্মভূমি কবিতার আলোকে উদ্দীপকের চরণ দুটিতে কবি মনের কোন দিকটি বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে?

ক. সৌন্দর্যবোধ খ. আত্মতৃপ্তি
গ. গভীর আবেগ ঘ. দেশপ্রেম

সৃজনশীল প্রশ্ন

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা;
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা;
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানি সে যে—আমার জন্মভূমি।

ক. কবির অঙ্গ জুড়ায় কীসে?
খ. কবির শেষ ইচ্ছা ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে 'জন্মভূমি' কবিতার কোন দিকটির মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপক ও কবিতায় জন্মভূমিকে 'রানি' সম্বোধন করার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করো।

সুখ

কামিনী রায়

নাই কিরে সুখ? নাই কিরে সুখ?—
　　এ ধরা কি শুধু বিষাদময়?
যাতনে জ্বলিয়া কাঁদিয়া মরিতে
　　কেবলি কি নর জনম লয়?—

বল ছিন্ন বীণে, বল উচ্চৈঃস্বরে—
　　না, না, না, মানবের তরে
আছে উচ্চ লক্ষ্য, সুখ উচ্চতর
　　না সৃজিলা বিধি কাঁদাতে নরে।

কার্যক্ষেত্র ঐ প্রশস্ত পড়িয়া
　　সমর-অঙ্গন সংসার এই,
যাও বীরবেশে কর গিয়া রণ:
　　যে জিনিবে সুখ লভিবে সে-ই।

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
　　এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মতো সুখ কোথাও কি আছে?
　　আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

পরের কারণে মরণেও সুখ;
　　'সুখ' 'সুখ' করি কেঁদ না আর,
যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে
　　ততই বাড়িবে হৃদয় ভার।

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
　　আসে নাই কেহ অবনী 'পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
　　প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।

শব্দার্থ ও টীকা

শব্দ		অর্থ
বিষাদময়	—	দুঃখময়।
ছিন্ন	—	ছেঁড়া।
বীণে	—	বাদ্যযন্ত্র বিশেষের মাধ্যমে।
উচ্চৈঃস্বরে	—	চড়া গলায়। বলিষ্ঠ কণ্ঠে।
সৃজিলা	—	সৃষ্টি করলেন।
বিধি	—	বিধাতা। প্রভু।
নরে	—	মানুষকে।
সমর	—	যুদ্ধ। লড়াই। রণ।
কার্যক্ষেত্র	—	কাজের জায়গা।
প্রশস্ত	—	প্রসারিত।
অঙ্গন	—	আঙিনা। উঠান। প্রাঙ্গণ।
জিনিবে	—	জয় করবে।
লভিবে	—	লাভ করবে।
পরের কারণে	—	অন্যের জন্য।
স্বার্থ	—	নিজের সুবিধা। ব্যক্তিগত লাভ।
আপনার	—	নিজের।
বলি	—	উৎসর্গ। ত্যাগ। বিসর্জন।
হৃদয়ভার	—	মনের কষ্ট।
বিব্রত	—	ব্যতিব্যস্ত। দিশেহারা। বিপন্ন।
অবনী	—	পৃথিবী। ধরা। জগৎ।

পাঠের উদ্দেশ্য

আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতা ত্যাগ করে মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

পাঠ-পরিচিতি

আমরা সবাই জীবনে সুখী হতে চাই। কিন্তু কীভাবে জীবনে সুখ আসতে পারে, 'সুখ' কবিতায় কবি সে সম্পর্কে তাঁর ধারণা তুলে ধরেছেন।

জগতে যারা কেবল সুখ খোঁজেন তারা জীবনে দুঃখ-যন্ত্রণা দেখে ভাবেন মানুষের জীবন নিরর্থক। এ ধারণা ভুল। জীবনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য আরও বিস্তৃত, অনেক মহৎ। দুঃখ-যন্ত্রণা সয়ে, সকল সংকট মোকাবিলা করে জীবনসংগ্রামে সফলতার মাধ্যমেই সুখ অর্জিত হয়।

কিন্তু সমাজের অন্য সবার কথা ভুলে কেউ যদি কেবল নিজের স্বার্থ দেখে, সে হয়ে পড়ে আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। আর সমাজ-বিচ্ছিন্ন মানুষ প্রকৃত সুখ লাভ করতে পারে না।

পক্ষান্তরে অন্যকে আপন ভেবে, অন্যের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে প্রীতি, ভালোবাসা, সেবা ও কল্যাণের মাধ্যমে যে অন্যের মঙ্গলের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে সেই প্রকৃত সুখী।

বস্তুত মানুষ সামাজিক জীব। পারস্পরিক ত্যাগের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে মানবসমাজ। এ সমাজে প্রতিটি মানুষ একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই অন্যকে বাদ দিয়ে এ সমাজে একলা বাঁচার কথা কেউ ভাবতে পারে না, সুখী হওয়া তো দূরের কথা।

কবি-পরিচিতি

প্রায় একশ বছর আগে এদেশে যে কজন মহিলা সাহিত্যচর্চা করে গেছেন তাঁদের একজন হলেন কবি কামিনী রায়। একসময় তিনি 'জনৈক বঙ্গমহিলা' ছদ্মনামে লিখতেন। তাঁর কবিতা সহজ, সরল, মানবিক ও উপদেশমূলক। তাঁর কবিতায় জীবনের মহৎ আদর্শের প্রতি গভীর অনুরাগের পরিচয় আছে। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তিনি 'আলো ও ছায়া' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 'সুখ' কবিতাটি ঐ কাব্যগ্রন্থেরই অন্তর্ভুক্ত।

তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : 'নির্মাল্য', 'অশোক সংগীত', 'দীপ ও ধূপ' ও 'জীবনপথে'। কবিতা ছাড়াও কামিনী রায় গল্প, নাটক ও জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন। সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী পদকে' সম্মানিত হন।

কামিনী রায়ের জন্ম ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বাকেরগঞ্জ (বর্তমান বরিশাল) জেলার বাসণ্ডা গ্রামে এবং মৃত্যু কলকাতায় ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে।

কর্ম-অনুশীলন

১. কে, কী করে সুখী হয়—এ বিষয়ে তোমার সহপাঠীদের মতামত নিয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা কর। প্রবন্ধে প্রত্যেকের মতামত হুবহু উদ্ধৃত করার চেষ্টা করবে।
২. সুখ বিষয়ে ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লিখে একটি বিষয়ভিত্তিক দেয়াল পত্রিকা তৈরি কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর কাজ)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কে সুখ লাভ করবে?

ক. যে উপকার করবে
খ. যে জীবনসংগ্রামে জয়ী হবে
গ. যে আত্মসচেতন হয়ে উঠবে
ঘ. যে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করবে

২. মনের কষ্ট বৃদ্ধি পায়—

i. সুখের জন্য কাঁদলে
ii. সুখ নিয়ে ভাবলে
iii. নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

সুমন ও নোমান পরস্পর বন্ধু। সুমনের বাবার মৃত্যুতে নোমান তাকে সার্বক্ষণিক সঙ্গ দিয়ে সান্ত্বনা দেয়। সাধ্যমত সুমনকে সে আর্থিকভাবেও সাহায্য করে। সুমনের সমস্যাকে নোমান নিজের সমস্যাই মনে করে।

৩. অনুচ্ছেদটির ভাবের সঙ্গে কোন কবিতার ভাবগত মিল রয়েছে?

ক. মানুষ জাতি খ. সুখ

গ. ঝিঙে ফুল ঘ. ফাগুন মাস

৪. উদ্দীপকের ভাবের ইঙ্গিতবাহী চরণ হচ্ছে—

i. বংশে বংশে নাহিকো তফাত

ii. সকলের তরে সকলে আমরা

iii. একজোট ঠিক আমরা যদি দাঁড়াই সবে রুখে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আলিম ও জামিল দুই ভাই। প্রবাসে গিয়ে আলিম প্রচুর সম্পদের মালিক হয়ে দেশে ফিরেছেন। বাড়ি-গাড়ি সবই করেছেন। নিজের সুখের সকল ব্যবস্থাই করেছেন। অপরদিকে জামিল কেবল নিজের সুখ নিয়েই ব্যস্ত নন। পরিবার ও পাড়া প্রতিবেশীর সুখে-দুঃখে তিনি এগিয়ে যান। অন্যের উপকার করার সুযোগ পেলে সুখী হন।

ক. 'অবনী' শব্দের অর্থ কী?

খ. সংসারকে সমর-অঙ্গন বলা হয়েছে কেন?

গ. উদ্দীপকের জামিল 'সুখ' কবিতায় বর্ণিত সুখী হবার কোন প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করেছে—ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'আলিমের সুখ প্রকৃত সুখ নয়।'—'সুখ' কবিতার আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

২. এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে অনিমা হতাশ হয়ে পড়ে। অনিমার বান্ধবী শারমিন বলল, সোহেলি অন্যের বাড়িতে কাজ করে ফাঁকে ফাঁকে পড়ে ভালোভাবে বি এ পাস করেছে। সুতরাং মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই। অনিমা, তুমি হাল ছেড়ে দিও না। আমার বিশ্বাস, চেষ্টা করলে তুমি ভালো ফল করতে পারবে।

ক. সংসারকে কবি কী বলেছেন?

খ. 'তার মতো সুখ কোথাও কি আছে?'—কবি এ চরণে কোন সুখের কথা বুঝিয়েছেন?

গ. অনিমার হতাশার মধ্যে 'সুখ' কবিতার যে দিকটি প্রকাশ পেয়েছে তার বর্ণনা দাও।

ঘ. "শারমিনের চিন্তা-ভাবনা কবির 'যাও বীরবেশে কর গিয়া রণ'—এ চরণের ভাবকেই যেন ধারণ করেছে।' — মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

মানুষ জাতি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
    সে জাতির নাম মানুষ জাতি;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
    একই রবি শশী মোদের সাথি।
শীতাতপ ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা
    সবাই আমরা সমান বুঝি,
কচি কাঁচাগুলি ডাঁটো করে তুলি
    বাঁচিবার তরে সমান যুঝি।
দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো,
    জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাঙা,
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
    ভিতরে সবারই সমান রাঙা।
বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ
    ভিতরের রং পলকে ফোটে,
বামুন, শূদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র
    কৃত্রিম ভেদ ধূলায় লোটে।
বংশে বংশে নাহিকো তফাত
    বনেদি কে আর গর-বনেদি,
দুনিয়ার সাথে গাঁথা বুনিয়াদ
    দুনিয়া সবারি জনম-বেদি।

শব্দার্থ ও টীকা

এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত — একই মায়ের দুধ পান করে যেমন সন্তান-সন্ততি বেড়ে ওঠে, তেমনি পৃথিবীর সব জাতি-ধর্ম-গোত্রের মানুষ একই পৃথিবীর খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে জীবন-যাপন করে।

রবি শশী — সূর্য ও চাঁদ।

শীতাতপ (শীত + আতপ) — ঠান্ডা ও গরম।

ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা — ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট।

কচি কাঁচাগুলি ডাঁটো করে তুলি — ছোটদের পরিপুষ্ট করে তুলি।

যুঝি — যুদ্ধ করি। লড়াই করি। সংগ্রাম করি।

তরে — জন্য (সাধারণত পদ্যে এ শব্দ ব্যবহৃত হয়)।

ডাঁটো — পুষ্ট। শক্ত। সমর্থ।

বাঁচিবার তরে সমান যুঝি — মানবিক জীবন-যাপনের জন্য সব মানুষই লড়াই করে।

বাসর বাঁধি গো — সম্প্রীতি গড়ে তুলি।

দোসর — সাথি। বন্ধু। সঙ্গী।

ধলো — সাদা। ফরসা। শুভ্র।

জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাঙা — জীবনসংগ্রামে কখনো বিপদে পড়ি আবার সংকট পেরিয়ে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখি।

ডাঙা — স্থল। উঁচুভূমি। চর।

জনম-বেদি — সূতিকাগৃহ। জন্মস্থান।

ছোপ — রঙের পোঁচ। ছাপ/দাগ।

বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ — মানুষের বাইরের চেহারার রং যাই হোক না কেন, আঁচড় লাগলে বা কেটে গেলে যে লাল রক্ত বের হয় তা বাইরের রঙের পার্থক্যকে ঘুচিয়ে দেয়।

শূদ্র — হিন্দু চতুর্বর্ণের (চার বর্ণের) একটি হলো শূদ্র।

বনেদি — প্রাচীন। সম্ভ্রান্ত।

গর-বনেদি — অভিজাত নয় এমন। তুলনীয়: গরহাজির।

বুনিয়াদ — ভিত্তি।

দুনিয়া সবারি জনম-বেদি — এ পৃথিবী সব মানুষেরই জন্মক্ষেত্র।

ব্রহ্ম — হিন্দু ধর্মমতে পরমেশ্বর বা বিধাতা।

পাঠের উদ্দেশ্য

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি সংবেদনশীলতা ও সমমর্যাদার মনোভাব সৃষ্টি ।

পাঠ-পরিচিতি

মানুষ জাতি কবিতাটি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'অভ্র আবীর' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। মূল কবিতার নাম 'জাতির পাঁতি'।

দেশে দেশে, ধর্মে ও বর্ণের পার্থক্য সৃষ্টি করে মানুষে মানুষে যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে, কবি মানুষকে তার চেয়ে উপরে আসন দিয়েছেন ।

আমাদের এই পৃথিবী জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষেরই বাসভূমি। এই ধরণীর স্নেহ-ছায়ায় এবং একই সূর্য ও চাঁদের আলোতে লালিত ও প্রতিপালিত হচ্ছে সব মানুষ । শীতলতা ও উষ্ণতা, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অনুভূতি সব মানুষেরই সমান। বাইরের চেহারায় মানুষের মধ্যে সাদা-কালোর ব্যবধান থাকলেও সব মানুষের ভেতরের রং এক ও অভিন্ন। সবার শরীরে প্রবাহিত হচ্ছে একই লাল রক্ত।

মানুষ আজ জাতিভেদ, গোত্রভেদ, বর্ণভেদ ও বংশকৌলীন্য ইত্যাদি কৃত্রিম পরিচয়ে নিজেদের পরিচয়কে সংকীর্ণ ও গণ্ডিবদ্ধ করেছে। কিন্তু গোটা দুনিয়ার সঙ্গে মানুষের যে জন্মসম্পর্ক, সেই বিচারে মানুষের আসল পরিচয় হচ্ছে সে মানুষ এবং তাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ থাকবার কথা নয়। সারা পৃথিবীতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র-পরিচয়ের ঊর্ধ্বে যে সমগ্র মানবসমাজ, কবি এই কবিতায় মানুষের সে পরিচয়কেই তুলে ধরেছেন। পৃথিবীর সব মানুষকে নিয়েই গড়ে উঠেছে মানুষ জাতি ।

কবি-পরিচিতি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার কাছাকাছি নিমতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটে। বৈচিত্র্যপূর্ণ ছন্দের কবিতা লিখে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'ছন্দের জাদুকর' হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্মজীবন শুরু করেছিলেন ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করে। কিন্তু পরে ব্যবসায় ছেড়ে সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি আরবি, ফারসি, ইংরেজিসহ অনেক ভাষা জানতেন। বিদেশি ভাষা থেকে উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ অনুবাদ করলেও কবি হিসেবেই তিনি অধিক পরিচিত। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'বেণু ও বীণা', 'কুহু ও কেকা', 'বিদায় আরতি' ইত্যাদি।

কর্ম-অনুশীলন

১. মানুষে মানুষে কী ধরনের ভেদাভেদ তোমার চোখে পড়েছে? তোমার দেখা মানুষজনের আলোকে উক্ত ভেদাভেদের বর্ণনা দাও এবং এই ভেদাভেদ কীভাবে কমিয়ে আনা যায় সে ব্যাপারে তোমার মতামত উপস্থাপন কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে কাকে 'ছন্দের জাদুকর' বলা হয়?

ক. কাজী নজরুল ইসলামকে

খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে

গ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে

ঘ. জসীমউদ্‌দীনকে

২. 'এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত'—এ উক্তিতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. একই পৃথিবীর স্নেহছায়ায় বেড়ে ওঠা

খ. জীবন ধারণের ভিন্ন উপাদান

গ. মানুষে মানুষে মেলবন্ধন

ঘ. মানবকল্যাণে কাজ করে যাওয়া

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুড়ে ঘরে।

৩. 'মানুষ জাতি' কবিতার যে বিষয়টি এখানে প্রাসঙ্গিক তা হলো—

i. সকল মানুষের ভালোবাসার অনুভূতি অভিন্ন

ii. সকল মানুষের অভ্যন্তরীণ গঠন অভিন্ন

iii. জাতিভেদ, বর্ণভেদ কৃত্রিম

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৪. উদ্দীপকটি 'মানুষ জাতি' কবিতার যে ভাবটি প্রকাশ করে তা হলো—

ক. বিশ্বভ্রাতৃত্ব

খ. সমমর্যাদা

গ. মমত্ব

ঘ. সংহতি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রহিম, শ্যামল ও রোজারিও তিন বন্ধু। ঈদ, পূজা ও বড়দিনে তারা একে অন্যের বাড়ি বেড়াতে যায়। আনন্দে-উৎসবে, সুখে-দুঃখে একে অন্যকে সাহায্য-সহযোগিতা করে। এরূপ আচরণে তাদের বাবা-মা খুব খুশি। রহিমের বাবা বলেন, 'তোমরা অসাধারণ। তোমাদের মতো সবাই বন্ধুসুলভ হলে এ পৃথিবী আরো সুন্দর বাসস্থান হবে।'

ক. 'মানুষ জাতি' কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

খ. 'দুনিয়া সবারি জনম-বেদি'—একথা দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

গ. রহিম, শ্যামল ও রোজারিওর বন্ধুত্বে 'মানুষ জাতি' কবিতার কোন বক্তব্যটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপকের রহিমের বাবার মন্তব্যই যেন 'মানুষ জাতি' কবিতার মূল সুর।"—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।
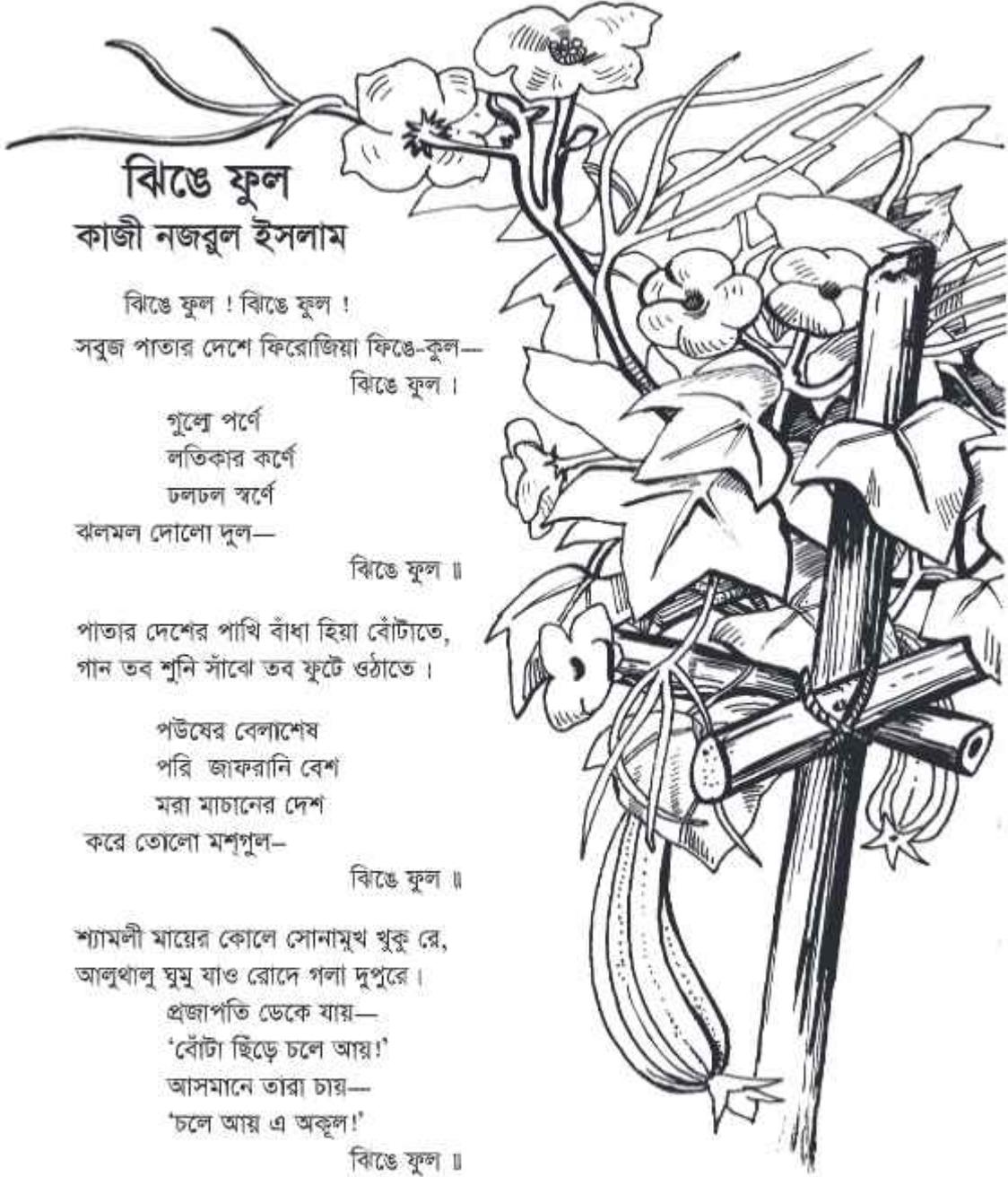
ঝিঙে ফুল

কাজী নজরুল ইসলাম

ঝিঙে ফুল ! ঝিঙে ফুল !
সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ফিঙে-কুল—
ঝিঙে ফুল ।

গুল্মে পর্ণে
লতিকার কর্ণে
ঢলঢল স্বর্ণে
ঝলমল দোলো দুল—
ঝিঙে ফুল ॥

পাতার দেশের পাখি বাঁধা হিয়া বোঁটাতে,
গান তব শুনি সাঁঝে তব ফুটে ওঠাতে ।

পউষের বেলাশেষ
পরি জাফরানি বেশ
মরা মাচানের দেশ
করে তোলো মশ্‌গুল–
ঝিঙে ফুল ॥

শ্যামলী মায়ের কোলে সোনামুখ খুকু রে,
আলুথালু ঘুমু যাও রোদে গলা দুপুরে ।
প্রজাপতি ডেকে যায়—
'বোঁটা ছিঁড়ে চলে আয়!'
আসমানে তারা চায়—
'চলে আয় এ অকূল!'
ঝিঙে ফুল ॥

তুমি বলো—'আমি হায়
ভালোবাসি মাটি-মা'য়,
চাই না ও অলকায়—
ভালো এই পথ-ভুল!'
ঝিঙে ফুল ॥

শব্দার্থ ও টীকা

ঝিঙে ফুল — ঝিঙে সবজির ফুল।
ফিরোজিয়া — ফিরোজা রঙের।
গুল্মে পর্ণে — ঝোপঝাড়ে ও পাতায়।
লতিকার কর্ণে — লতার কানে।
হিয়া — হৃদয়।
সাঁঝে — সন্ধ্যায়।
পউষের — পৌষ মাসের।
পরি — পরিধান করে।
জাফরানি — জাফরান রঙের।
মাচান — মাচা। পাটাতন।
আলুথালু — এলোমেলো।
মশগুল — বিভোর। মগ্ন।
অকূল — কূল বা তীর বিহীন। সীমাহীন।
অলকা — স্বর্গের নাম। হিন্দু ধর্মের ধন-দৌলতের দেবতা কুবেরের আবাসস্থল।

পাঠের-উদ্দেশ্য

পরিবেশ-চেতনা অর্জন ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি।

পাঠ-পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত হলেও প্রকৃতির প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও মমত্ববোধ ছিল গভীর। 'ঝিঙে ফুল' কবিতায় কবির এই প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের অতি পরিচিত ঝিঙে ফুলকে উদ্দেশ্য করে তিনি এ কবিতাটি লিখেছেন। পৌষের বেলাশেষে সবুজ পাতার এ দেশে জাফরান রং নিয়ে ঝিঙে ফুল মাচার উপর ফুটে আছে। তাকে বোঁটা ছিঁড়ে চলে আসার জন্য প্রজাপতি ডাকছে। আকাশে চলে যাওয়ার জন্য তারা ডাকলেও ঝিঙে ফুল মাটিকে ভালোবেসে মাটি-মায়ের কাছেই থাকবে। এ কবিতায় প্রকৃতির প্রতি কবির ভালোবাসা একটি ঝিঙে ফুলকে কেন্দ্র করে অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

কবি-পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহের কবি, প্রেমের কবি, মানবতার কবি। অন্যায়, শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে উদ্দীপনামূলক কবিতা লিখে বাংলার জনমনে তিনি 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে নন্দিত আসন পেয়েছেন।

বহুবিচিত্র ও বিস্ময়কর তাঁর জীবন। ছেলেবেলায় লেটোর দলে গান করেছেন, রুটির দোকানের কারিগর হয়েছেন, যুদ্ধে যোগ দিয়ে সেনাবাহিনীর হাবিলদার হয়েছেন। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে কারাবরণ করেছেন, পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন।

বিস্ময়কর তাঁর সৃষ্টি। কবিতা, উপন্যাস, নাটক, সংগীত ইত্যাদি রচনার মাধ্যমে যে জগৎ তিনি তৈরি করেছেন তা অভিনব। তিনি যে শুধু বড়োদের জন্য অনেক গ্রন্থ লিখেছেন তা নয়, ছোটদের জন্যও তিনি লিখেছেন অনেক কাব্য, গান, নাটক ও গল্প। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে : 'ঝিঙেফুল', 'পিলে পটকা', 'ঘুমজাগানো পাখি', 'ঘুমপাড়ানী মাসিপিসি' এবং নাটক হচ্ছে 'পুতুলের বিয়ে'।

নজরুলের কবিতা ও গান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। তাঁর লেখা গান 'চল্ চল্ চল্' আমাদের রণসংগীত। তিনি আমাদের জাতীয় কবি।

নজরুলের জন্ম ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে মে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

কর্ম-অনুশীলন

১. ১৫টি ফুলের নাম লেখ। ফুলের রং, আকৃতি, পাপড়ি, গন্ধ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য দাও।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঝিঙে ফুল কী রঙে ফুটেছে?

ক. হলুদ খ. সবুজ
গ. ফিরোজিয়া ঘ. সাদা

২. 'ঝিঙে ফুল' কবিতায় কবির কোন মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে?

ক. দেশের প্রতি ভালোবাসা খ. মায়ের প্রতি ভালোবাসা
গ. মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা ঘ. প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা

৩. ঝিঙে ফুলকে কাছে পাওয়ার জন্য কে আহ্বান জানিয়েছে?

ক. প্রজাপতি
খ. পাখি
গ. মেঘ
ঘ. রোদ

উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

আবু বকর বহুদিন ধরে শহরে বাস করছে। গ্রামে জন্ম হলেও গ্রামের সেই চমৎকার দৃশ্য আর সে দেখতে পায় না। সরষে ফুলের হলুদ বনে প্রজাপতির লুটোপুটি যে কত মনোরম তা দেখার জন্য আবু বকর এবার গ্রামের বাড়িতে যাবে। সে অনেক মজা করবে।

৪. আবু বকরের গ্রামে যাওয়ার আগ্রহ 'ঝিঙে ফুল' কবিতার কোন চরণটিতে ফুটে উঠেছে?

ক. চলে আয় এ অকূল খ. পৌষের বেলাশেষ
গ. মরা মাচানের দেশ ঘ. ভালোবাসি মাটি-মা'য়

৫. 'ঝিঙে ফুল' কবিতার সাথে তুলনীয় যে বিষয়টি উদ্দীপকে রয়েছে তা হলো –

i. প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা

ii. সৌন্দর্যপ্রেম

iii. দেশের প্রতি অনুরাগ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii   খ. i ও iii

গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আবদুর রবের একমাত্র ছেলে ফয়সাল। লেখাপড়ায় সে বেশ ভালো। ফয়সালের মামা তাকে ঢাকায় এনে লেখাপড়া করাতে চান। কিন্তু ফয়সাল গ্রামের এ চমৎকার পরিবেশ ছেড়ে কোলাহলপূর্ণ ঢাকায় যেতে চায় না।

ক. হিয়া অর্থ কী?

খ. 'চাই না ও অলকায়'—এর দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

গ. ফয়সালের মামার চাওয়া 'ঝিঙে ফুল' কবিতার প্রজাপতির ডাকের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত—ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'ফয়সাল এবং ঝিঙে ফুলের ইচ্ছা যেন একই সূত্রে গাঁথা।'—উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

এলো যে মুহম্মদ

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

কুল মখলুকাতের জুলমত ভেদি

এলো যে মুহম্মদ

বেহেশতি রওশন ছড়ায়ে

মোস্তফা আহমদ ॥

তাঁর পুণ্যের জ্যোতি পড়ে যে ছড়ায়ে

গিরি দরী বন ভুবন ভরায়ে

হেসে ওঠে যত পাপী–তাপী আর

সন্তাপী উম্মৎ ॥

দরুদ সবার কণ্ঠে কণ্ঠে

সুধাসম পড়ে ঝরে

সাল্লাল্লাহু মোস্তফা বলে

হৃদয় যে ওঠে ভরে।

তাঁর মধুনাম যার কানে গেল

তকবির বলে দিওয়ানা সে হলো

সোয়াবের শত পাঁপড়ি যেন গো

মেলে দিল কোকনদ ॥

শব্দার্থ ও টীকা

কুল	— গোটা, সমস্ত।
জুলমত	— অন্ধকার।
বেহেশতি	— বেহেশতের, স্বর্গীয়।
ভুবন	— বিশ্ব।
উম্মৎ	— দল।
সুধাময়	— সুধার সমান।
তকবির	— আল্লাহু আকবার বলা।
দিওয়ানা	— পাগল।
পাঁপড়ি	— পুষ্পদল, ফুলের পাতা।
মখলুকাত	— সৃষ্টি।
ভেদি	— ভেদ করে।
রওশন	— আলো।
জ্যোতি	— আলো।
দরী	— গুহা।
সন্তাপী	— দুঃখী, দুঃখপ্রাপ্ত।
দরুদ	— নবি (স.)–এর জন্য দোয়া বিশেষ।
সোয়াব	— পুণ্য।
কোকনদ	— রক্তপদ্ম, রক্তবর্ণ।

কবিতা–পরিচিতি

সমগ্র সৃষ্টির অজ্ঞানতার অন্ধকার ভেদ করে হযরত মুহম্মদ (স.) এর আবির্ভাব পুণ্যের আলো নিয়ে। তাঁর আগমনে সমগ্র মানবজাতি, প্রকৃতি এবং বিশ্বচরাচরে বয়ে যায় আনন্দের হিল্লোল। বিশ্বের সকল পাপী–তাপী মুক্তি পেল তাঁর আগমনে। তাঁর মধুময় নামে বিমোহিত হলো সবার হৃদয়। হযরত মুহম্মদ (স.)–এর আবির্ভাবে স্রষ্টার করুণা পদ্মের মতোই শত পাপড়ি মেললো বিশ্বভুবনে।

কবি–পরিচিতি

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এর জন্ম ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে যশোর শহরে। শিক্ষা জীবনে সর্বত্র কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে বি. এ (অনার্স) ও এম. এ. উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগ দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি গবেষণা করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মূলত কবি ও গীতিকার। তাছাড়া তিনি গবেষক ও গবেষণা নির্দেশক। ২০০৮ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এ পর্যন্ত মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এর ১৫টি কাব্যগ্রন্থ, ৭টি প্রবন্ধের বই, ৪টি নাটক ও বেশ কয়েকটি সম্পাদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে; 'কবি আলাওল' 'ইচ্ছেমতি'।

অনুশীলনী

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. মখলুকাত অর্থ কী?

ক. প্রাণী খ. সৃষ্টি

গ. আলো ঘ. বেহেশ্‌ত

২. তার মধু নাম যার কানে গেল — এখানে কার নামের কথা বলা হয়েছে?

ক. হযরত মুহম্মদ (স.) এর খ. কবির

খ. আল্লাহর ঘ. সকল নবীর

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ষষ্ঠ শ্রেণিতে ধর্মীয় শিক্ষক জনাব নিজামউদদীন বলেন, আমাদের মহানবী (সা.) যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন আরবের লোকেরা নানা পাপ কাজে লিপ্ত ছিল। তিনি তাদেরকে আল্লাহর করুণা ও রহমতের কথা শোনালেন। সকলেই তার ব্যবহারে মুগ্ধ ছিল। পাপী আর দুঃখী মানুষেরা এক আলোর পথের সন্ধান পেল; সবার কাছে তিনি আশ্রয়দাতা হয়ে উঠলেন। দলে দলে মানুষ এসে তাদের দুঃখের কথা, সমস্যার কথা জানাতে লাগলো। নবীজী সাধ্যমত তাদের সাহায্য করতেন, সান্ত্বনার বাণী শোনাতেন, চোখের পানি মুছিয়ে দিতেন। তাদের মুখে হাসি ফুটে উঠতো।

ক. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান কত সালে জন্মগ্রহণ করেন ?

খ. 'কুল মাখলুকাতের জুলমত ভেদি' - এ চরণের দ্বারা কবি কী বুঝিয়েছেন ?

গ. শিক্ষকের কথায় 'এলো যে মুহম্মদ' কবিতার কোন দিক ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'উদ্দীপকের শিক্ষকের বক্তব্যটি 'এলো যে মুহম্মদ' কবিতাটির মূল বক্তব্য প্রকাশ করেছে' -কথাটি বিশ্লেষণ কর।

২. মাদ্রাসার বার্ষিক মিলাদ মাহফিলে সকল ছাত্র ছাত্রীই উপস্থিত। সামনে বসা নিয়ে সোয়েল, কামাল আর রাতুলের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হলো। সোয়েল ধনীর ছেলে, সে কামালকে পাশে নিতে চায় না, কারণ কামাল দরিদ্র পরিবারের ছেলে। আবার রাতুল পড়াশুনায় খারাপ বলে তাকেও পাশে বসতে দিচ্ছে না। স্কুলের প্রধান শিক্ষক তা দেখতে পেয়ে বললেন, তোমরা একে অপরের ভাইয়ের মতো। ইসলাম ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকলকে সমান চোখে দেখে। তোমরা শান্ত হয়ে বসো।

ক. 'এলো যে মুহম্মদ' কবিতার কবির নাম কী ?

খ. 'হেসে ওঠে যত পাপী তাপী আর
সন্তাপী উম্মৎ' -এই চরণ দ্বারা কবি কী বুঝাতে চেয়েছেন ?

গ. প্রধান শিক্ষকের কথায় 'এলো যে মুহম্মদ' কবিতায় ভ্রাতৃত্বের দিকটি কিভাবে ফুটে উঠেছে, তা বর্ণনা কর।

ঘ. উদ্দীপকের প্রধান শিক্ষকের ভূমিকাটি 'এলো যে মুহম্মদ' কবিতার মহানবী (সা.) এর ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় -যুক্তি দেখাও।

চিঠি বিলি

রোকনুজ্জামান খান

ছাতা মাথায় ব্যাঙ চলেছে
চিঠি বিলি করতে,
টাপুস টুপুস ঝরছে দেয়া
ছুটছে খেয়া ধরতে।
খেয়ানায়ের মাঝি হলো
চিংড়ি মাছের বাচ্চা,
দু চোখ বুজে হাল ধরে সে
জবর মাঝি সাচ্চা।
তার চিঠিও এসেছে আজ
লিখছে বিলের খলসে,
সাঁঝের বেলার রোদে নাকি
চোখ গেছে তার ঝলসে।
নদীর ওপার গিয়ে ব্যাঙা
শুধায় সবায়ঃ ভাইরে,
ভেটকি মাছের নাতনি নাকি
গেছে দেশের বাইরে?
তার যে চিঠি এসেছে আজ
লিখছে বিলের কাতলা:
এবার সারা দেশটি জুড়ে
নামবে দারুণ বাদলা।
তাই তো নিলাম ছাতা কিনে
আসুক এবার বর্ষা,
চিংড়ি মাঝির খেয়া না আর
ছাতাই আমার ভরসা।

শব্দার্থ ও টীকা

কাতলা	— মাছের নাম।
খলসে	— মাছের নাম।
খেয়া	— নদী পার হওয়ার নৌকা।
খেয়া না	— খেয়া নৌকা।
খেয়ানায়ের মাঝি	— খেয়া নৌকার মাঝি।
চিঠি	— পত্র; খবর বা কুশলাদি জানিয়ে কাউকে লেখা।
চিঠি বিলি করা	— চিঠি পৌঁছে দেওয়া।
ঝলসানো	— উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধানো।
টাপুস টুপুস	— বৃষ্টি পড়ার শব্দ।
দেয়া	— মেঘ।
বাদলা	— একনাগাড়ে বৃষ্টি।
ভরসা	— নির্ভর করা, অবলম্বন।
ভেটকি	— মাছের নাম।
সাঁঝের বেলা	— সন্ধ্যার সময়।
সাচ্চা	— সত্য।

পাঠের উদ্দেশ্য

ছড়া ও ছন্দের মাধ্যমে কল্পনাকে উদ্দীপিত করা।

পাঠ-পরিচিতি

রোকনুজ্জামান খানের 'হাট্ টিমা টিম' বই থেকে ছড়াটি সংকলন করা হয়েছে। এ ছড়ায় ছন্দে ছন্দে মজার একটি গল্প পরিবেশিত হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে, চিঠি বিলি করার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়েছে একটি ব্যাঙ। কিন্তু বাইরে টাপুস টুপুস করে বৃষ্টি ঝরছে। ব্যাঙটিকে খেয়া নৌকায় নদী পাড়ি দিতে হবে। নৌকার মাঝি হিসেবে কাজ করছে চিংড়ি মাছের বাচ্চা। তাকে চিঠি লিখেছে বিলের খলসে মাছ। খলসে লিখেছে, সন্ধ্যাবেলার রোদে তার চোখ ঝলসে গিয়েছে। ওদিকে ভেটকি মাছের নাতনির কাছে চিঠি লিখেছে বিলের কাতলা মাছ। চিঠিতে কাতলা জানিয়েছে, সারা দেশ জুড়ে এ বছর খুব বৃষ্টি হবে। এই ভয়ে ব্যাঙ একটি ছাতা কিনে নিয়েছে। কারণ চিংড়ি মাঝির খেয়া নৌকার ওপর ব্যাঙের কোনো ভরসা নেই। ছড়াটির মাধ্যমে রোকনুজ্জামান খান আমাদের কল্পনাকে নিয়ে যান জলজ প্রাণীদের জগতে। সেখানে আমরা অদ্ভুত সব ঘটনার মুখোমুখি হই। ব্যাঙের চিঠি বিলি করা, ছাতা কেনা, চিংড়ি মাছের নৌকার মাঝি হওয়া কিংবা মাছেদের চিঠি লেখা বাস্তবে অসম্ভব ঘটনা। কিন্তু সব ঘটনাকেই আমরা কল্পনা করে নিতে পারি। কেননা মানুষের কল্পনা অসীম। ছড়া, কবিতা ও গল্পের মাধ্যমে কবি-লেখকেরা মানুষের জীবনছবি আঁকার পাশাপাশি মানুষের অদ্ভুত ও অসম্ভব কল্পনাকেও আঁকতে পারেন।

কবি-পরিচিতি

রোকনুজ্জামান খান ১৯২৫ সালে রাজবাড়ি জেলার পাংশায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন শিশু সাহিত্যিক। সাংবাদিক হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন। 'দাদাভাই' ছদ্মনামে তিনি পত্রিকায় শিশুদের জন্য বিশেষ পাতা সম্পাদনা করতেন। এ নামেই রোকনুজ্জামান খান বিশেষভাবে পরিচিতি পেয়েছিলেন। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য শিশুতোষ বই 'হাট্ টিমা টিম' (১৯৬২), 'খোকন খোকন ডাক পাড়ি'। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকার নাম 'কচি ও কাঁচা'। রোকনুজ্জামান খান 'কচি-কাঁচার মেলা' নামে একটি শিশু-কিশোর সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯৯৯ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

১. এ কবিতায় যেসব প্রাকৃতিক উপাদানের নাম আছে, তার প্রতিটির এক বাক্যের পরিচয়সহ তালিকা প্রস্তুত করো (দলগত কাজ)।
২. কোনো মজার ঘটনা বর্ণনা করে বন্ধুকে চিঠি লেখো (একক কাজ)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. দেশের বাইরে গেছে কে?

ক. চিংড়ি মাছের বাচ্চা খ. ভেটকি মাছের নাতনি
গ. বিলের কাতলা ঘ. বিলের খলসে

২. ব্যাঙ ছাতা কিনে নিয়েছিলো কেন?

ক. কাতলা মাছের চিঠি পড়ে খ. বর্ষা থেকে বাঁচতে
গ. চিংড়ি মাঝির খেয়ায় না উঠতে ঘ. ছাতা সুন্দর দেখে

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

রফিক মাদ্রাসায় যাওয়ার পথে প্রায় সময় সহপাঠী অমিতের বাইসাইকেলের পেছনের সিটে বসার আবদার করে। অমিতও তাকে না করতে পারে না। কিন্তু কয়েকদিন যাওয়ার পর রফিক অমিতের অনাগ্রহ ও বিরক্তি বুঝতে পারে। সে এটাও জানতে পারে যে, একদিন অমিত তাকে সাইকেল থেকে ফেলে দেবে। এ অবস্থায় রফিক নিজেই একটা সাইকেল কেনার সিদ্ধান্ত নেয়। স্কুলে যেতে সে আর সহপাঠীর সাইকেলের উপর নির্ভর করে না।

৩. উদ্দীপকের রফিক চরিত্রটি 'চিঠি বিলি' ছড়ায় কোন চরিত্রটির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ?

ক. চিংড়ি মাঝি খ. ভেটকি মাছ
গ. কাতলা মাছ ঘ. ব্যাঙ

৪. উদ্দীপকে রফিকের সাইকেল কেনার সঙ্গে 'চিঠি বিলি' ছড়ার মিল রয়েছে–

i. চিংড়ি মাঝির হাল ধরার
ii. ব্যাঙের ছাতা কেনার
iii. ব্যাঙের খেয়া নায়ের উপর ভরসা না করার

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সামির এলাকায় খুব পরিচিত একজন ছেলে। সে প্রতিদিন এলাকার গৃহস্থ বাড়ি থেকে গরুর দুধ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে। এ কাজের মাধ্যমে উপার্জিত আয় দিয়ে তার সংসার চলে। দুধ নিয়ে বাজারে যাওয়ার সময় সে গ্রামের ভালো-মন্দ সকল খবর অন্যদের শুনিয়ে যায়। নিজের কাজের সঙ্গে এ ধরনের খবর পরিবেশন করার মধ্য দিয়ে সামির এক অন্যরকম আনন্দ পায়।

ক. সাঁঝের বেলার রোদে কার চোখ ঝলসে গেছে?
খ. 'জবর মাঝি সাচ্চা'—কে? বুঝিয়ে লিখ।
গ. উদ্দীপকের সামির চরিত্রের সঙ্গে 'চিঠি বিলি' ছড়ায় কার চরিত্র সঙ্গতিপূর্ণ এবং কেন? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "নির্ধারিত কাজের বাইরেও ছোটো ছোটো কাজের মাধ্যমে মানুষ অন্যরকম আনন্দ পেতে ও দিতে পারে"– উদ্দীপক ও 'চিঠি বিলি' ছড়া অবলম্বনে এ উক্তির যৌক্তিকতা নির্ণয় কর।

বাঁচতে দাও

শামসুর রাহমান

এই তো দ্যাখো ফুলবাগানে গোলাপ ফোটে,
ফুটতে দাও।
রঙিন কাটা ঘুড়ির পিছে বালক ছোটে,
ছুটতে দাও।

নীল আকাশের সোনালি চিল মেলছে পাখা,
মেলতে দাও।
জোনাক পোকা আলোর খেলা খেলছে রোজই,
খেলতে দাও।

মধ্য দিনে নরম ছায়ায় ডাকছে ঘুঘু,
ডাকতে দাও।
বালির ওপর কত্ত কিছু আঁকছে শিশু,
আঁকতে দাও।

কাজল বিলে পানকৌড়ি নাইছে সুখে,
নাইতে দাও।
গহিন গাঙে সুজন মাঝি বাইছে নাও,
বাইতে দাও।

নরম রোদে শ্যামা পাখি নাচ জুড়েছে,
নাচতে দাও।
শিশু, পাখি, ফুলের কুঁড়ি—সবাইকে আজ
বাঁচতে দাও।

শব্দার্থ ও টীকা

রঙিন কাটা ঘুড়ি — ঘুড়ি উড়িয়ে কাটাকাটির লড়াইয়ে সুতো কেটে যাওয়া রঙিন ঘুড়ি।

জোনাক পোকা আলোর খেলা
খেলছে রোজই — সন্ধ্যার অন্ধকারে জোনাকিরা আলো জ্বালিয়ে যেন খেলায় মাতে।

সবাইকে আজ বাঁচতে দাও — প্রকৃতি কেবল মানুষের বসবাসের জায়গা নয়—গাছপালা, পশুপাখি সকলেরই আছে বাঁচার সমান অধিকার। তা না হলে মানুষের অস্তিত্বও হুমকির মুখে পড়বে।

পানকৌড়ি — কালো রঙের হাঁস জাতীয় মাছ-শিকারি পাখি।

নাইতে — গোসল করতে। স্নান করতে।

গহিন — গভীর। অতল। গহন।

গাঙে — নদীতে।

পাঠের উদ্দেশ্য

প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরা।

পাঠ-পরিচিতি

প্রকৃতি ও পরিবেশ মানুষের বেঁচে থাকার প্রধান আশ্রয়। মানুষ ও প্রকৃতি পরিবেশের অংশ। অথচ মানুষের হাতেই দিন দিন এগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ফলে বিপন্ন হচ্ছে মানুষ ও প্রাণীদের জীবন। আমাদের চারপাশ যদি সজীব ও সুন্দর না হয় তাহলে বেঁচে থাকার আনন্দই বৃথা হয়ে যাবে।

কবি শামসুর রাহমান 'বাঁচতে দাও' কবিতায় প্রকৃতি, পরিবেশ ও প্রাণিজগতের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের কথা বলেছেন। একটি শিশুর বেড়ে ওঠার সঙ্গে তার চারপাশের সুস্থ পরিবেশের সম্পর্ক রয়েছে। যদি পৃথিবীতে ফুল না থাকে, পাখি না থাকে, সবুজ ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হবে। কবিতায় এইসব প্রতিকূলতাকে জয় করার কথাই সুন্দর করে তুলে ধরা হয়েছে।

কবি-পরিচিতি

শামসুর রাহমানের কবিতায় নাগরিক জীবন, মুক্তিযুদ্ধ, গণ-আন্দোলন নানা অনুভূতিতে রূপায়িত হয়েছে। তাঁর কবিতা তাই দেশপ্রেম ও সমাজ সচেতনতায় সতেজ ও দীপ্ত। তিনি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কবি।

শামসুর রাহমান পেশায় সাংবাদিক। বিভিন্ন সময়ে তিনি 'মর্নিং নিউজ', 'রেডিও বাংলাদেশ', 'দৈনিক গণশক্তি' ইত্যাদিতে সাংবাদিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রায় এক দশক ধরে তিনি ছিলেন 'দৈনিক বাংলা'র সম্পাদক। কবিতা অনুবাদেও তিনি সিদ্ধহস্ত। এছাড়া তিনি উপন্যাস, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা লিখেছেন।

শিশুদের জন্যও শামসুর রাহমান চমৎকার কবিতা লিখেছেন। 'এলাটিং বেলাটিং', 'ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো', 'গোলাপ ফোটে খুকীর হাতে' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য ছড়া কবিতার বই।

সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতি হিসেবে কবি শামসুর রাহমান অনেক পুরস্কার ও পদকে ভূষিত হয়েছেন। এসব পুরস্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক ও মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন স্বর্ণপদক।

শামসুর রাহমানের জন্ম ঢাকায় ১৯২৯ সালে। তাঁর পৈতৃক নিবাস নরসিংদী জেলার পাড়াতলী গ্রামে। তিনি ২০০৬ সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, চলো আমরা মজা করে কবিতাটি আবৃত্তি করি। এ জন্য প্রথমেই আমাদের উপস্থিত বন্ধুদের দুই দলে ভাগ করে নিতে হবে। 'ক' দলের বন্ধুরা কবিতার একটি অংশ সমবেতভাবে আবৃত্তি করবে, সাথে সাথে 'খ' দলের বন্ধুরা পরের নির্ধারিত অংশ আবৃত্তি করবে। এ নিয়মটি আমরা পরের বার উল্টে দিতে পারি। তাহলে চলো বৃন্দ-আবৃত্তিটি করি।

ক-দল	খ-দল
এই তো দ্যাখো ফুল বাগানে গোলাপ ফোটে	ফুটতে দাও
রঙিন কাটা ঘুড়ির পিছে বালক ছোটে	ছুটতে দাও
নীল আকাশের সোনালি চিল মেলছে পাখা	মেলতে দাও
জোনাক পোকা আলোর খেলা খেলছে রোজই	খেলতে দাও
মধ্যদিনে নরম ছায়ায় ডাকছে ঘুঘু	ডাকতে দাও
বালির ওপর কত্ত কিছু আঁকছে শিশু	আঁকতে দাও
কাজল বিলে পানকৌড়ি নাইছে সুখে	নাইতে দাও
গহিন গাঙে সুজন মাঝি বাইছে নাও	বাইতে দাও
নরম রোদে শ্যামা পাখি নাচ জুড়েছে	নাচতে দাও
শিশু, পাখি, ফুলের কুঁড়ি— সবাইকে আজ	বাঁচতে দাও

এবার চলো যে কোনো একজন কবিতাটির ভাবার্থ পাঠ করে শোনাই। লক্ষ করো, কবিতাটির আবৃত্তি ও পাঠের মধ্যে কী কী পার্থক্য রয়েছে। এবার নিচের ছকে পাঠ ও আবৃত্তির মধ্যে পার্থক্যগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করো (প্রথমটি করে দেয়া আছে)।

	আবৃত্তির বৈশিষ্ট্য	পাঠের বৈশিষ্ট্য
১.	আবৃত্তি কবিতা বা ছড়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য	পাঠ সাধারণত গদ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য
২.		
৩.		
৪.		
৫.		

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটির পেছনে বালক ছোটে?

ক. ফড়িঙের　　খ. ঘুড়ির

গ. প্রজাপতির　　ঘ. জোনাকির

২. 'ছোট্ট শিশু বাদলা দিনে ভিজছে সুখে'—এরকম চরণ হলে 'বাঁচতে দাও' কবিতার আলোকে পরের চরণটি কী হবে?

ক. নাইতে দাও　　খ. ভিজতে দাও

গ. খেলতে দাও　　ঘ. থামিয়ে দাও

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ছোট্ট মেয়ে ফাহমিদা মনের আনন্দে হালকা বৃষ্টিতে ভিজেছে। ফাহমিদার মা এর জন্য ফাহমিদাকে অনেক বকেছে। কিন্তু ফাহমিদার বাবা ফাহমিদার মাকে বলেছেন, ফাহমিদার মতো বয়সে তুমি, আমি, সকলেই বৃষ্টিতে ভিজতে চাইতাম। শিশুদের ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক।

৩. ফাহমিদার বাবার মানসিকতার সঙ্গে 'বাঁচতে দাও' কবিতার সঙ্গতিপূর্ণ বক্তব্য হচ্ছে—

i. ফুলকে ফুটতে দিতে হবে

ii. চিলকে ছোঁ মারতে দিতে হবে

iii. ঘুঘুকে ডাকতে দিতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

৪. 'বাঁচতে দাও' কবিতার আলোকে ফাহমিদার মা'র আচরণে প্রকাশ পেয়েছে কোনটি?

ক. স্নেহপরায়ণতা　　খ. প্রতিকূলতা

গ. সাবধানতা　　ঘ. বিরক্তিবোধ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. খাল-বিল, নদী-নালা আর পুকুরে ভরা এই দেশ। ছোটবেলায় গ্রামের খাল-বিল-পুকুরেই সাঁতার কাটা শিখেছিলেন নাজির সাহেব। সন্তানদের নিয়ে তিনি এখন শহরে বাস করেন। গ্রামের বাড়িতেও আগের সেই খাল-বিল-পুকুর নেই। সন্তানদের সাঁতার কাটা শেখাতে পারছেন না। নাজির সাহেব আক্ষেপ করে বলেন, এভাবে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটলে আমাদের আগেকার জীবনযাত্রা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে কেবল কাগজ-কলমেই বেঁচে থাকবে।

ক. প্রতিদিন কে আলোর খেলা খেলছে?

খ. কাজল বিলে পানকৌড়িকে নাইতে দেওয়ার আহ্বান দ্বারা কবি কী বুঝাতে চেয়েছেন?

গ. উদ্দীপকের সাঁতার কাটার সঙ্গে 'বাঁচতে দাও' কবিতার শিশুর কাজটির সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের নাজির সাহেবের আক্ষেপের মধ্যে 'বাঁচতে দাও' কবিতার মূলসুরটি ফুটে উঠেছে। —মন্তব্যটি প্রমাণ কর।

২. চলে যাবো—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

* * * *

বাসা থেকে একটু দূরে অন্যদের খেলতে দেখে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী মিতুরও খেলার প্রবল আগ্রহ জাগল। কিন্তু বাড়ি থেকে তার বেরুতে বাধা। তার চিন্তা, উপরের চরণগুলোর বাস্তবায়ন ঘটিয়ে কেউ যদি তার সে বাধা দূর করে দিত।

ক. সুজন মাঝি কোথায় নৌকা বাইছে?

খ. ফুটতে দাও, ছুটতে দাও—এ কথাগুলো দ্বারা কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ. উদ্দীপকের মিতুর সঙ্গে 'বাঁচতে দাও' কবিতার শিশুর যে মিল রয়েছে তার বর্ণনা দাও।

ঘ. 'কবির আহ্বান আর উদ্দীপকের চরণগুলোর অঙ্গীকার একই সূত্রে গাঁথা।'—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

পাখির কাছে ফুলের কাছে

আল মাহমুদ

নারকেলের ঐ লম্বা মাথায় হঠাৎ দেখি কাল
ডাবের মতো চাঁদ উঠেছে ঠান্ডা ও গোলগাল।
ছিটকিনিটা আস্তে খুলে পেরিয়ে গেলাম ঘর
ঝিমধরা এই মস্ত শহর কাঁপছিলো থরথর।
মিনারটাকে দেখছি যেন দাঁড়িয়ে আছেন কেউ,
পাথরঘাটার গির্জেটা কি লাল পাথরের ঢেউ?
দরগাতলা পার হয়ে যেই মোড় ফিরেছি বাঁয়
কোত্থেকে এক উটকো পাহাড় ডাক দিলো আয় আয়।

পাহাড়টাকে হাত বুলিয়ে লালদিঘির ঐ পাড়
এগিয়ে দেখি জোনাকিদের বসেছে দরবার।
আমায় দেখে কলকলিয়ে দিঘির কালো জল
বললো, এসো, আমরা সবাই না-ঘুমানোর দল—
পকেট থেকে খোলো তোমার পদ্য লেখার ভাঁজ
রক্তজবার ঝোঁপের কাছে কাব্য হবে আজ।
দিঘির কথায় উঠল হেসে ফুল পাখিরা সব
কাব্য হবে, কাব্য হবে—জুড়লো কলরব।
কী আর করি পকেট থেকে খুলে ছড়ার বই
পাখির কাছে, ফুলের কাছে মনের কথা কই।

শব্দার্থ ও টীকা

ডাবের মতো চাঁদ উঠেছে ঠান্ডা ও গোলগাল	—	জ্যোৎস্নামাখা পূর্ণিমায় গোল চাঁদকে ডাবের মতো কল্পনা করে কবি তুলনার চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছেন।
থরথর	—	কেঁপে ওঠার ভাব বোঝায় এমন শব্দ। এখানে শব্দটি সৌন্দর্য ও আবেগ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।
মিনার	—	মসজিদের উঁচু স্তম্ভ। গম্বুজযুক্ত দালান।
গির্জে	—	খ্রিষ্টানদের উপাসনালয়।
উটকো	—	অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রত্যাশিত। এখানে মমত্বের অনুভূতি বোঝাতে উটকো শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।
দরবার	—	রাজসভা। জলসা। এখানে আনন্দ-আসর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
কলকলিয়ে	—	কলকল ধ্বনি করে।
পদ্য লেখার ভাঁজ	—	ভাঁজ করে রাখা কবিতা লেখা কাগজ।
কলরব	—	কোলাহল।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিসর্গপ্রীতি জাগ্রত করা।

পাঠ-পরিচিতি

'পাখির কাছে ফুলের কাছে' শীর্ষক কবিতাটি আল মাহমুদের 'পাখির কাছে ফুলের কাছে' নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। এই কবিতায় কবির নিসর্গপ্রেম গভীর মমত্বের সঙ্গে ফুটে উঠেছে।

এই কবিতায় কবি প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের কাছে যেতে চান, তাদের সঙ্গে মিশে যেতে চান। প্রকৃতি যেন মানুষের পরম আত্মীয়, সখা। কবি মনোরম সেই প্রকৃতির আহ্বান শুনতে পান। জড় প্রকৃতি আর জীব-প্রকৃতির মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান কবি সেই সম্পর্কের সৌন্দর্য ও আনন্দ অনুভব করেন। আর তাঁর ছড়া-কবিতার খাতা ভরে ওঠে প্রকৃতির সেই সৌন্দর্য ও আনন্দের পঙ্ক্তিমালায়।

কবি-পরিচিতি

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কবি আল মাহমুদ ১৯৩৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মোড়াইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জর্জ সিক্সথ স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পাস করেন। সাংবাদিকতা ও চাকরি ছিল তাঁর পেশা। তিনি 'গণকণ্ঠ' ও 'কর্ণফুলী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। মাঝের দীর্ঘ সময় তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে চাকরি করেন এবং পরিচালক হিসেবে ১৯৯৫ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বই হলো—'লোক-লোকান্তর', 'কালের কলস', 'সোনালি কাবিন', 'মায়াবী পর্দা দুলে উঠো', 'মিথ্যাবাদী রাখাল', 'একচক্ষু হরিণ', 'আরব্য রজনীর রাজহাঁস', 'পাখির কাছে ফুলের কাছে' ইত্যাদি।

সাহিত্যে অসাধারণ অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকসহ বহু পুরস্কারে ভূষিত হন। তিনি ২০১৯ সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

১. কবিতাটির বিভিন্ন অংশ অবলম্বনে একাধিক ছবি আঁক।

২. প্রকৃতি নিয়ে (ফুল-পাখি-লতা-পাতা, নদ-নদী) ছড়া-কবিতা লিখতে চেষ্টা কর। তোমার প্রিয় কোনো কবিকে অনুসরণ করেও লিখতে পার।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'পাখির কাছে ফুলের কাছে' কবিতায় কবি তাঁর মনের কোন কথাটি বলতে চান?

ক. চাঁদের সৌন্দর্য খ. জীবের সৌন্দর্য

গ. নিসর্গপ্রেম ঘ. প্রকৃতির গুরুত্ব

২. 'পাখির কাছে ফুলের কাছে' কবিতা অনুসারে প্রকৃতি মানুষের–

ক. আশীর্বাদ খ. পরম আত্মীয়

গ. সর্বশেষ আশ্রয় ঘ. আনন্দের উৎস

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

লালগিরি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে মনিরের মনে হলো সৃষ্টির এই অপরূপ অপার-লীলা আগে কখনও তার দেখার সৌভাগ্য হয় নি। মনের অজান্তে সে হারিয়ে গেল অন্য এক কাল্পনিক জগতে। সৃষ্টির রহস্য তার মনকে আবেগ-আপ্লুত করল। তার ইচ্ছে হল, প্রকৃতির কাছে হৃদয়ের অব্যক্ত কথা প্রকাশ করতে।

৩. উদ্দীপকের বক্তব্য কবিতার কোন চরণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ?

ক. পাখির কাছে ফুলের কাছে মনের কথা কই।

খ. কোত্থেকে এক উটকো পাহাড় ডাক দিল আয় আয়।

গ. এগিয়ে দেখি জোনাকিদের বসেছে দরবার।

ঘ. ঝিম ধরা এই মস্ত শহর কাঁপছিলো থরথর।

৪. মনিরের ভাবনার সাথে কবি আল মাহমুদের ভাবনার মিল কোথায়?

ক. পাহাড়ের সৌন্দর্য বর্ণনায় খ. জীবপ্রকৃতির বর্ণনায়

গ. প্রকৃতির বিচিত্র রূপ উপভোগে ঘ. প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি মমত্ববোধে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. পাহাড়টাকে হাত বুলিয়ে লালদিঘির ঐ পাড়

এগিয়ে দেখি জোনাকিদের বসেছে দরবার।

আমায় দেখে কলকলিয়ে দিঘির কালো জল

বললো, এসো, আমরা সবাই না-ঘুমানোর দল–

* * *

বাঁশবাগানের আধখানা চাঁদ

থাকবে ঝুলে একা।

ঝোপে ঝাড়ে বাতির মতো

জোনাক যাবে দেখা।

ক. 'পাখির কাছে ফুলের কাছে' কবিতায় কোথায় আজ কাব্য হবে।

খ. কবি আল মাহমুদের দৃষ্টিতে প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক বর্ণনা কর।

গ. কবিতাংশ দুটিতে প্রকৃতির যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'কবিতাংশ দুটিতে কবিদ্বয়ের নিসর্গ-প্রেম ফুটে উঠেছে'– মন্তব্যটি 'পাখির কাছে ফুলের কাছে' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২. একটি টিভি চ্যানেল 'জীবন ও প্রকৃতি' নামে একটি অনুষ্ঠান প্রচার করে। অনুষ্ঠানটিতে প্রকৃতির বিচিত্র রূপ, পাহাড়ি দৃশ্য, ঝর্নার গতিময় ছন্দ, ফুল ও প্রজাপতির মিলনমেলা, বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা, বনে জীবজন্তুর অবাধ বিচরণ, বিভিন্ন কীটপতঙ্গের বিচরণ, নদনদীর ছন্দময় গতি ইত্যাদি দেখানো হয়। শর্মিলী তার বাবার কাছে প্রশ্ন করল, 'জীবন ও প্রকৃতি' নামে টেলিভিশনে যে অনুষ্ঠানটি প্রচার করছে তাতে আমাদের শিক্ষণীয় কী? বাবা বললেন, এদের সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি পূর্ণতা পায়। এককথায় বলা যায়, এরা একে অপরের পরিপূরক।

ক. কবি আল মাহমুদ কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

খ. কবি 'পাখির কাছে ফুলের কাছে' কবিতায় কীভাবে নিসর্গ-প্রেম প্রকাশ করেছেন?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অনুষ্ঠানটি কোন অর্থে 'পাখির কাছে ফুলের কাছে' কবিতার প্রতিচ্ছবি?– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শর্মিলীর বাবার সর্বশেষ উক্তির যথার্থতা 'পাখির কাছে ফুলের কাছে' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

ফাগুন মাস
হুমায়ুন আজাদ

ফাগুনটা খুব ভীষণ দস্যি মাস
পাথর ঠেলে মাথা উঁচোয় ঘাস।
হাড়ের মতো শক্ত ডাল ফেঁড়ে
সবুজ পাতা আবার ওঠে বেড়ে।
সকল দিকে বনের বিশাল গাল
ঝিলিক দিয়ে প্রত্যহ হয় লাল।
বাংলাদেশের মাঠে বনের তলে
ফাগুন মাসে সবুজ আগুন জ্বলে।

ফাগুনটা খুব ভীষণ দুঃখী মাস
হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়ায় দীর্ঘশ্বাস
ফাগুন মাসে গোলাপ কাঁদে বনে
কান্নারা সব ডুকরে ওঠে মনে।
ফাগুন মাসে মায়ের চোখে জল
ঘাসের ওপর কাঁপে যে টলমল।
ফাগুন মাসে বোনেরা ওঠে কেঁদে
হারানো ভাই দুই বাহুতে বেঁধে।

ফাগুন মাসে ভাইয়েরা নামে পথে
ফাগুন মাসে দস্যু আসে রথে।
ফাগুন মাসে বুকের ক্রোধ ঢেলে
ফাগুন তার আগুন দেয় জ্বেলে।
বাংলাদেশের শহর গ্রামে চরে
ফাগুন মাসে রক্ত ঝরে পড়ে।
ফাগুন মাসে দুঃখী গোলাপ ফোটে
বুকের ভেতর শহিদ মিনার ওঠে।

সেই যে কবে কয়েকজন খোকা
ফুল ফোটালো–রক্ত থোকা থোকা—
গাছের ডালে পথের বুকে ঘরে
ফাগুন মাসে তাদেরই মনে পড়ে।
সেই যে কবে—তিরিশ বছর হলো—
ফাগুন মাসের দু-চোখ ছলোছলো।
বুকের ভেতর ফাগুন পোষে ভয়—
তার খোকাদের আবার কী যে হয়!
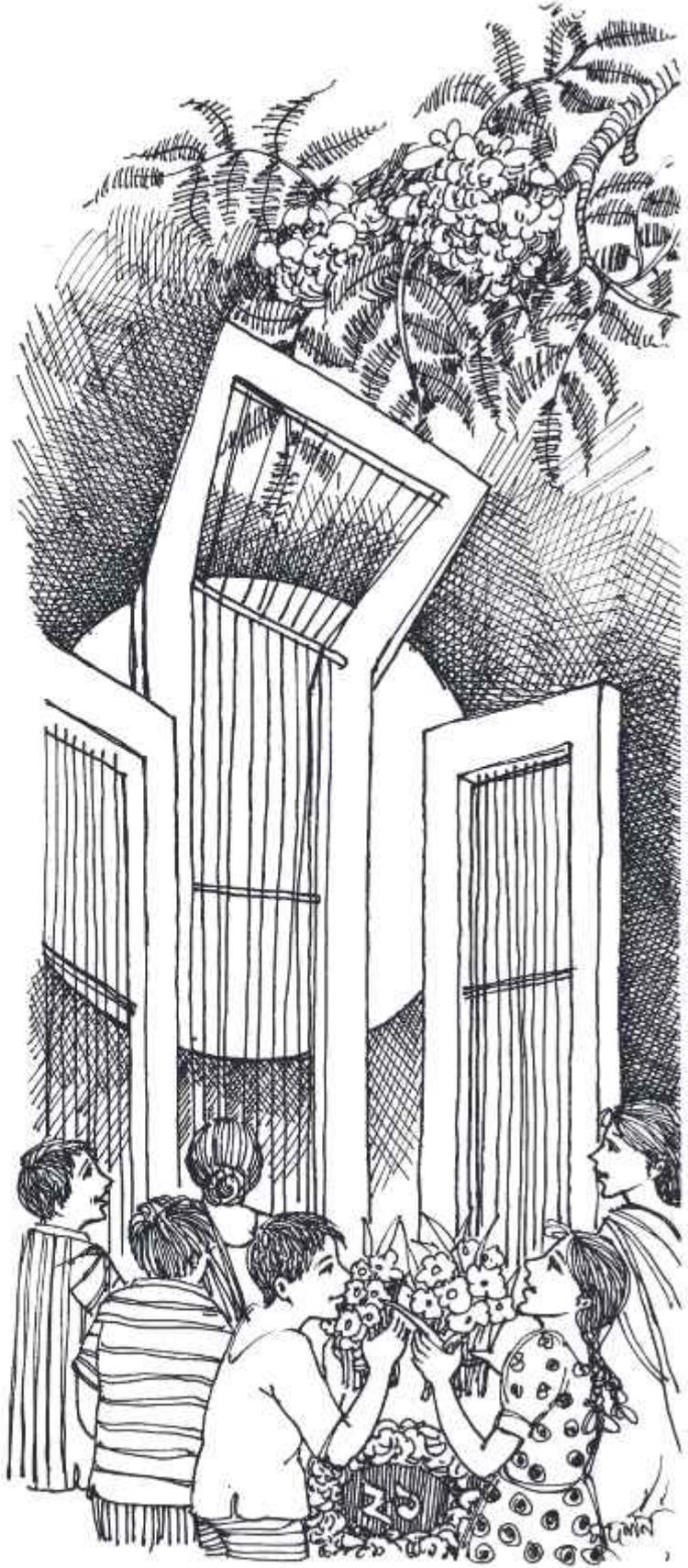
শব্দার্থ ও টীকা

ফাগুন	—	ফাল্গুন। বাংলা বছরের একাদশ মাস।
ভীষণ দস্যি মাস	—	ফাল্গুন মাসকে দুরন্ত মাস হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে।
পাথর ঠেলে মাথা উঁচোয় ঘাস	—	পাথরের বুকেও ঘাস জন্মায়।
ফেঁড়ে	—	চিরে, বিদীর্ণ করে।
সকল দিকে বনের বিশাল গাল	—	গাছপালার বিপুলতা বোঝানো হয়েছে।
প্রত্যহ হয় লাল	—	লাল ফুলের সম্ভারে রঙিন হয়ে ওঠে।
সবুজ আগুন জ্বলে	—	বনের সবুজ বিস্তারকে কবি সবুজ আগুন বলে কল্পনা করছেন।
ভীষণ দুঃখী মাস	—	ফাগুন মাস দুঃখের ইতিহাসের স্মৃতি-বিজড়িত। এ মাসেই ভাষা-শহিদেরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।
ডুকরে ওঠে	—	থেমে থেমে জোরে জোরে কান্না উথলে ওঠে।
ফাগুন মাসে মায়ের চোখে জল	—	এ মাসে শহিদ পুত্রের কথা স্মরণ করে মায়ের চোখে জল আসে।
ফাগুন মাসে ভাইয়েরা নামে পথে	—	এ মাসে শহিদদের অমর আদর্শে বাংলার দামাল সন্তানেরা বারবার সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে।
ফাগুন মাসে দস্যু আসে রথে	—	১৯৫২-র ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনকারীদের নির্মম নির্যাতন ও হত্যা করা হয়। কবি আক্রমণকারী পাকিস্তানিদের দস্যু বলে অভিহিত করেছেন।
বুকের ক্রোধ ঢেলে	—	প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রকাশ করে।
ফাগুন মাসে রক্ত ঝরে পড়ে	—	এ মাসে ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ করা হয়েছে।
বুকের ভেতর শহিদ মিনার ওঠে	—	ফাল্গুন মাসে দেশপ্রেমিক প্রতিটি বাঙালি শহিদ দিবসের চেতনায় আলোড়িত হয়।

পাঠের উদ্দেশ্য

বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিতে মাতৃভাষা ও দেশপ্রেমবোধে উদ্বুদ্ধ করা।

পাঠ-পরিচিতি

বাংলাদেশের ইতিহাসে ফাল্গুন মাসের সঙ্গে একুশে ফেব্রুয়ারি একই সূত্রে গাঁথা। কেননা এ মাসেই বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে ঢাকার রাজপথ বাংলার সাহসী সন্তানদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল। প্রতি বছর যখন ফাগুন মাস আসে, তখন আমাদের স্মৃতি চলে যায় ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তঝরা দিনে। বসন্ত ঋতুর প্রথম মাস ফাল্গুন। প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের পাশাপাশি এই মাস আমাদের মধ্যে দুঃখবোধ জাগিয়ে দেয়। আমাদের পূর্বপুরুষদের আত্মত্যাগের গৌরবে আমরাও একই সঙ্গে দুঃখী এবং সাহসী হয়ে উঠি।

'ফাগুন মাস' কবিতায় তুলে ধরা হয়েছে শোক ও বেদনার গভীর অনুভূতি। আমাদের ফাল্গুন অন্য দেশের ফাল্গুন মাসের মতো নয়। বাংলাদেশের ফাল্গুনে বনের ভেতর জ্বলে সবুজ আগুন, আমরা ভাষার জন্য আত্মদানকারী পূর্বপুরুষদের জন্য অনুভব করি দুঃখ ও মমতা। আবার তাঁদের আত্মত্যাগের শক্তি সাহস জোগায় আমাদের মনে। আমাদের প্রত্যেকের ভেতরেই গোলাপ ফুলের মতো একেকটা শহিদ মিনার জেগে ওঠে। আমরা বাংলার বীর সন্তানদের স্মরণ করি প্রতিটি ফাল্গুনে।

কবি-পরিচিতি

হুমায়ুন আজাদ ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের (বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলা) রাড়িখালে জন্মগ্রহণ করেন। একজন কৃতী ছাত্র হিসেবে তিনি তাঁর শিক্ষাজীবন শেষ করেন। কর্মজীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন গবেষক হিসেবে তিনি খ্যাতি পেয়েছেন। একাধারে তিনি ছিলেন ভাষাবিজ্ঞানী, কবি, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক। তাঁর গবেষণাগ্রন্থ হচ্ছে 'বাক্যতত্ত্ব' এবং কিশোরদের জন্য তাঁর লেখা দুটি গ্রন্থ 'লাল নীল দীপাবলি' ও 'কতো নদী সরোবর'। তিনি ১৯৮৭ সালে সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। হুমায়ুন আজাদ ২০০৪ সালে জার্মানির মিউনিখ শহরে মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

'ফাগুন মাস' কবিতাটি ভালোভাবে পড়। কবিতাটিতে ফাল্গুন মাসে প্রকৃতির কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। আর আছে কিছু ঘটনার ইশারা। কবিতাটি পড়ে নিচের দুটি ছকে সে দুটি দিক লিখ।

ফাগুন মাসে প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য

১। গাছে গাছে সবুজ পাতা গজায়

২।

৩।

৪।

৫।

ফাগুন মাসে ঘটে যাওয়া ঘটনার ইশারা

১। ফাগুন মাস দুঃখী মাস

২।

৩।

৪।

৫।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ফাগুন মাসে কাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়?

ক. শহিদ বুদ্ধিজীবীদের　　খ. ভাষা-শহিদদের
গ. মুক্তিযোদ্ধাদের　　ঘ. বীরশ্রেষ্ঠদের

২. 'ফাগুন মাসে রক্ত ঝরে পড়ে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. চারদিক লাল ফুলে শোভিত হওয়া　　খ. মায়ের চোখের জল
গ. ভাষা-আন্দোলনে আত্মত্যাগ　　ঘ. মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের আত্মত্যাগ

৩. 'ফাগুন মাসে তাদেরই মনে পড়ে'— এখানে তাদেরই বলতে বোঝানো হয়েছে—

i. ভাষা-সৈনিকদের
ii. মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের
iii. ভাষা-শহিদদের

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ রোপিত হয়েছিল ভাষা-আন্দোলনের মাধ্যমে। জাতীয় সংকটকালে বাঙালি বারবার একতাবদ্ধ হয়ে মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করেছে। বায়ান্নতে বাঙালির একীভূত শক্তি মাতৃভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় '৭১ সালে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে আমাদের মহান স্বাধীনতা।

৪. কোন শক্তিবলে বাঙালি বারবার স্বাধীনতা-আন্দোলন সংগ্রামে সফল হয়েছিল?

ক. দেশের যুবশক্তির বলে　　খ. আত্মত্যাগের শক্তিতে
গ. হরতাল মিছিল দ্বারা　　ঘ. ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের সাহায্যে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

ক. 'ফাগুন মাস' কবিতার প্রথম চরণে ফাগুনকে কী বলা হয়েছে?

খ. ফাগুন মাসে কেন দুঃখী গোলাপ ফোটে? বুঝিয়ে লেখ।

গ. চিত্রকর্মটিতে 'ফাগুন মাস' কবিতার বিষয়গত মিল দেখাও।

ঘ. চিত্রকর্মটি 'ফাগুন মাস কবিতার ভাবকে ধারণ করেছে।'—এ বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দাও।

২. বন্ধুদের নিয়ে বাগানে পায়চারি করছিল শাওন। হঠাৎ তারা লক্ষ করল গাছের ডালপালায় সবুজ পাতা পল্লবিত হয়ে উঠেছে। আমের মুকুলে গুঞ্জন করছে মৌমাছি। পাতার আড়ালে শোনা যাচ্ছে কোকিলের মায়াবী কণ্ঠ। তখন সবাই বুঝতে পারল প্রকৃতিতে ধ্বনিত হচ্ছে বসন্তের আগমনী বার্তা।

ক. 'ফাগুন মাস' কবিতার রচয়িতা কে?

খ. 'ফাগুন মাসে সবুজ আগুন জ্বলে'— 'সবুজের' আগুন বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন তা বর্ণনা কর।

গ. উদ্দীপকের দৃশ্যপটটি 'ফাগুন মাস' কবিতার কোন অংশের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ—ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে 'ফাগুন মাস' কবিতার মূলভাব পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়নি।— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

কর্ম-অনুশীলন

মুখস্থনির্ভর মূল্যায়ন ব্যবস্থার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা এবং তাদের আগ্রহ, কৌতূহল ও ভালো লাগার জগতকে বিকশিত করার জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন অতীব জরুরি বিষয়। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ ও নতুন শিক্ষাক্রমে ধারাবাহিক মূল্যায়নের এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যপুস্তকগুলোতে কর্ম-অনুশীলন অংশে ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য কিছু নমুনা কর্মপত্র উল্লেখ করা হয়েছে। এসব কর্মপত্রের মধ্যে বেশ কিছু কাজের উল্লেখ আছে যার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বিকাশের সুযোগ রয়েছে; বিনোদনের ভিতর দিয়ে তাদের দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ থাকছে এবং বাচনকলা থেকে শুরু করে সৌন্দর্যবোধ, ন্যায়পরায়ণতা, বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবিকতাবোধ, শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতা, অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ ইত্যাদি বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়নের যে দক্ষতাগুলোর সঙ্গে শিক্ষকগণ ও শিক্ষার্থীরা ইতোমধ্যে পরিচিত হয়েছেন, সেই চিন্তন দক্ষতা, সমস্যা-সমাধান দক্ষতা, যোগাযোগ দক্ষতা (মৌখিক ও লিখিত), ব্যক্তিক দক্ষতা, সামাজিক দক্ষতা ও সহযোগিতামূলক দক্ষতা বিকাশের নিশ্চয়তার আলোকে মূল্যায়ন করাই এই পর্বের উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এসব দক্ষতার বিকাশ ঘটলে তারা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে এবং পরিবর্তিত পরিবেশ-পরিস্থিতি সাফল্যের সঙ্গে মোকাবেলা করতে পারবে।

কর্ম-অনুশীলন অংশে দেওয়া কর্মপত্রগুলো নমুনা মাত্র। শিক্ষকগণ তাঁদের মাদ্রাসার সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে উল্লেখিত কাজগুলো করাতে পারেন কিংবা নতুন কোনো কাজও দিতে পারেন। তবে নতুন কোনো কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিবেচনায় রাখতে হবে।

সৃজনশীল প্রশ্ন : কিছু কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৫-'৯৬ সালে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়। কিন্তু এ শিক্ষাক্রমের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন তথা পরীক্ষাপদ্ধতির সংস্কার করা হয় নি।

বিষয়টি বিবেচনা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষাপদ্ধতি সংস্কার করে সৃজনশীল প্রশ্ন প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগকে সফল ও অর্থবহ করার জন্য এসএসসি পরীক্ষাপদ্ধতি সংস্কারের আলোকে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসহ প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড পাঠ্যপুস্তকের প্রতিটি অধ্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বিগত বছরগুলোর এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মোট নম্বরের শতকরা ৮০ ভাগ প্রশ্ন স্মৃতিনির্ভর, যা শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করে উত্তর দেয়। অবশিষ্ট অধিকাংশ প্রশ্ন অনুধাবন স্তরের। প্রয়োগ ও উচ্চতর চিন্তন-দক্ষতা মূল্যায়নের প্রশ্ন খুবই কম। প্রচলিত এ পরীক্ষাপদ্ধতি মূলত শিক্ষার্থীর মুখস্থ করার ক্ষমতাকে মূল্যায়ন করে আসছে।

বস্তুত মুখস্থ, সাজেশন ও নোটনির্ভর এ পরীক্ষাপদ্ধতি শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে প্রভাবিত করছে। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তক বুঝে লেখাপড়ার পরিবর্তে মুখস্থ করার ওপর বেশি জোর দিচ্ছে। আর এ মুখস্থ করাও একটি কঠিন কাজ এবং এতে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভাবিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। এসব কারণে শিক্ষার্থীদের মেধার যথাযথ বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার বিকাশ ও মেধার যথার্থ মূল্যায়ন নিশ্চিত করার জন্য পরীক্ষাপদ্ধতির সংস্কার অপরিহার্য। শিক্ষার্থীর পাঠলব্ধ জ্ঞান ও অনুধাবনকে নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ এবং উপাত্ত ও ঘটনা বিচার-বিশ্লেষণ করার সামর্থ্য যাচাই করার মতো ব্যবস্থা প্রশ্নপত্রে থাকা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সৃজনশীল প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে।

প্রশ্নপত্রে পরিবর্তন

প্রচলিত এসএসসি পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন তিন ধরনের প্রশ্নের সাহায্যে হয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ও রচনামূলক প্রশ্ন। পরীক্ষা-সংস্কারের মাধ্যমে প্রচলিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের পরিবর্তে দক্ষতাভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং সংক্ষিপ্ত-উত্তর ও রচনামূলক প্রশ্নের পরিবর্তে দক্ষতাভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন প্রবর্তন করা হয়েছে।

সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন-প্রক্রিয়া

□	সৃজনশীল প্রশ্ন একটি দৃশ্যকল্প/উদ্দীপক, সূসনা-বক্তব্য (Stem বা Scenario) দিয়ে শুরু হবে।
□	দৃশ্যকল্প/উদ্দীপকটি কোনো ঘটনা, গল্প, চিত্র, মানচিত্র, গ্রাফ, সারণি, পেপার কাটিং, ছবি, উদ্ধৃতি, অনুচ্ছেদ ইত্যাদি হতে পারে।
□	দৃশ্যকল্প হবে মৌলিক (Unique)। পাঠ্যপুস্তকে সরাসরি এ দৃশ্যকল্পটি থাকবে না। তবে বাংলা ও ধর্ম বিষয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দৃশ্যকল্প রচনায় পাঠ্যপুস্তক থেকে উদ্ধৃতাংশ ব্যবহার করা যাবে।
□	দৃশ্যকল্পটি শিক্ষাক্রমের/পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুর আলোকে হতে হবে।
□	দৃশ্যকল্পটি আকর্ষণীয় ও সহজে বোধগম্য হতে হবে।
□	দৃশ্যকল্পের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে প্রশ্নের অংশগুলো তৈরি হবে এবং প্রতিটি অংশ সহজ থেকে কাঠিন্যের ক্রমানুসারে হবে।
□	প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্ন চিন্তন-দক্ষতার চারটি স্তরের (ক-অংশ : জ্ঞান; খ-অংশ : অনুধাবন; গ-অংশ : প্রয়োগ; ঘ-অংশ: উচ্চতর দক্ষতা) সমন্বয়ে গঠিত হবে।
□	হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের তিন স্তরের (সহজ, মধ্যম ও কঠিন) সমন্বয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন গঠিত হবে।
□	দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপকে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থাকবে না, তবে উত্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণা থাকবে। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের মোট নম্বর হবে ১০।

একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ ও নম্বর বণ্টন

প্রশ্নের অংশ	চিন্তন-দক্ষতার স্তর	নম্বর
ক	**জ্ঞান-দক্ষতা** কোনো ঘটনা, তথ্য, তত্ত্ব, নীতিমালা, পদ্ধতি, প্রকারভেদ ইত্যাদি স্মরণ করে বা মুখস্থ করে লিখতে পারার দক্ষতাকে জ্ঞান স্তরের দক্ষতা বোঝায়।	১
খ	**অনুধাবন-দক্ষতা** কোনো অনুচ্ছেদ, কবিতা, প্রবন্ধ, লেখচিত্র ইত্যাদি পড়ে বুঝতে পারা, এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা, কোনো কিছু একটা নিয়মে সাজানো, নিয়ম ও বিধি, তথ্য, তত্ত্ব, নীতিমালা, পদ্ধতি ইত্যাদি পাঠ্যবই হতে হুবহু মুখস্থ না করে বুঝে নিজের ভাষায় উত্তর করার দক্ষতাকে অনুধাবন স্তরের দক্ষতা বলে।	২
গ	**প্রয়োগ-দক্ষতা** এটি হলো কোনো অর্জিত জ্ঞান এবং অনুধাবন নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার দক্ষতা। সূত্র, নিয়ম-বিধি ইত্যাদি প্রয়োগ করে নতুন পরিস্থিতিতে কোনো প্রকৃত সমস্যার সমাধান করতে পারার দক্ষতাকে প্রয়োগ স্তরের দক্ষতা বলে।	৩
ঘ	**উচ্চতর দক্ষতা** কোনো বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ (বিশেষ থেকে সাধারণ), সংশ্লেষণ (সাধারণ থেকে বিশেষ) ও মূল্যায়ন করার দক্ষতা হলো উচ্চতর দক্ষতা। আন্তঃসম্পর্ক, সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নির্ণয়, তুলনা করা, পার্থক্য করা, কোনো গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য তৈরি করা, সিদ্ধান্ত নেওয়া, কোনো সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করা, মতামত প্রদান, প্রতিবেদন তৈরি করা ইত্যাদি উচ্চতর স্তরের দক্ষতার অন্তর্ভুক্ত।	৪

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল ষষ্ঠ–চারুপাঠ (বাংলা)

বাবা-মাকে ভক্তি করো।